সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

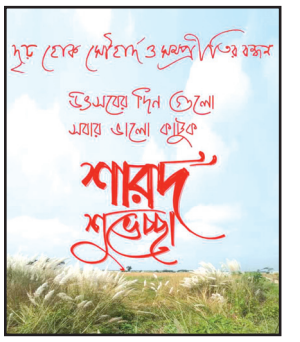

পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০২২ ■ ৫০তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে আবারও বিক্ষোভ রাজ্য কর্মচারীদের

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় মহার্ঘভাতা প্রাপ্তিতে ৩১ শতাংশ কম মহার্ঘভাতা পাচ্ছিলেন এই রাজ্যের কর্মচারীরা। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত মহার্ঘভাতার পরিমাণ ৩৪ শতাংশ,

নবমহাকরণ

অথচ রাজ্য কর্মচারীরা পান মাত্র ৩ শতাংশ। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার সময় রাজ্য সরকার বাড়ি ভাড়া ভাতা পূর্বের ১৫ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ কমিয়ে ১২ শতাংশ করে। স্বভাবতই ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কোনো আর্থিক সুফল কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা পাননি। অথচ সারা ভারত ভোগপণ্যের মূল্য সূচকের (এ আই সি পি আই) ভিত্তিতেই পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতে পুনরায় আবেদন করা হলেও, তা খারিজ হয়ে যায়। পাশাপাশি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ধারাবাহিক বিক্ষোভ চলছেই। গত ৩০ আগস্ট রাজ্যজুড়ে পালিত হয়েছে দু-ঘণ্টার কর্মবিরতি। কিন্তু মেলা-খেলা-উৎসব-মচ্ছবে দেদার খরচে সিদ্ধহস্ত রাজ্য সরকার শিক্ষক কর্মচারীদের আইনত প্রয়োগযোগ্য এই অধিকারটিকে বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে উপেক্ষা করে চলেছে। স্বভাবতই

পূর্বাঞ্চল

দার্জিলিং জেলা

কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতে পুনরায় আবেদন করা হলেও, তা খারিজ হয়ে যায়। পাশাপাশি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ধারাবাহিক বিক্ষোভ চলছেই। গত ৩০ আগস্ট রাজ্যজুড়ে পালিত হয়েছে দু-ঘণ্টার কর্মবিরতি। কিন্তু মেলা-খেলা-উৎসব-মচ্ছবে দেদার খরচে সিদ্ধহস্ত রাজ্য সরকার শিক্ষক কর্মচারীদের আইনত প্রয়োগযোগ্য এই অধিকারটিকে বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে উপেক্ষা করে চলেছে। স্বভাবতই কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পরিবর্তন ঘটিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামী দিনে প্রশাসনকে সম্পূর্ণ অচল করার মতো কর্মসূচীর দিকে সংগঠন যেতে বাধ্য হবে বলে বিক্ষোভ সভাগুলি থেকে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন। □

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে সমহারে মহার্ঘভাতা প্রদানের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল পঞ্চম বেতন কমিশন। এমনকি উচ্চ আদালতও মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত রায়ে রাজ্য সরকারকে একই নির্দেশ দেয়। এমনকি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই রায় দাঁড়াল ৩৫ শতাংশ।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়। যা রাজ্য কর্মচারীদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে সারা রাজ্যে টিফিন বিরতিতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভাগুলিতে এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। শারদোৎসবের প্রাক্ মুহূর্তে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যেও বিভিন্ন জেলা সদর ও কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনগুলিতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভাগুলিতে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্য সরকার তার বর্তমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে রাজ্য কর্মচারীদের বকেয়ার পরিমাণ

লবণহ্রদ

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে

২০তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরে কদমতলাতে জনস্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রচার মূলক শিবির।

রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে ৪ নভেম্বর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে সমাবেশ

আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লক সম্মেলন উপলক্ষ্যে মিছিল

বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লক সম্মেলন

মালদা জেলায় মধ্য অঞ্চলের সম্মেলন

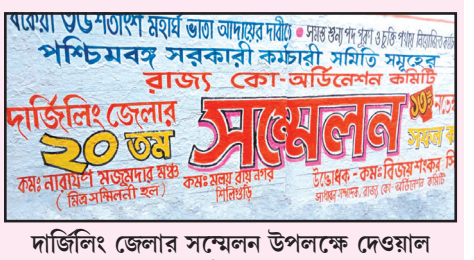

দার্জিলিং জেলার সম্মেলন উপলক্ষে দেওয়াল লিখন

কুমারগ্রাম ব্লকে সম্মেলন

সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার পাঠচক্র

সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার বিপুল সংখ্যক গ্রাহককে পাঠকে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণের কথা সংগঠনের কেন্দ্রীয় স্তর থেকে বারবারই বলা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে সম্প্রতিকালে সংগঠনের বর্ধমান জেলা শাখা ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করছে, যা প্রশংসনীয়। পত্রিকার জুলাই-আগস্ট সংখ্যা নিয়ে যে

পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয় তারই চিত্র এখানে দেওয়া হল।

অন্যান্য জেলা ও অঞ্চল কমিটিগুলিও এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে কেন্দ্রীয় কমিটি আশা করে। বর্তমান সময়ে কর্পোরেট পরিচালিত মিডিয়ায় অর্ধ সত্য ও মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত সত্যকে কর্মচারীদের কাছে তুলে ধরার যে প্রয়াস পত্রিকার পক্ষ থেকে করা হয়, তা সফল করার জন্য গ্রাহককে পাঠকে রূপান্তর অত্যন্ত জরুরি। □

টেট উত্তীর্ণ অনশন আন্দোলনরত হবু শিক্ষকদের পাশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি সহ নেতৃবৃন্দ

এস এস কে এম হাসপাতালের ভেতরে কর্মচারীদের কর্মবিরতি

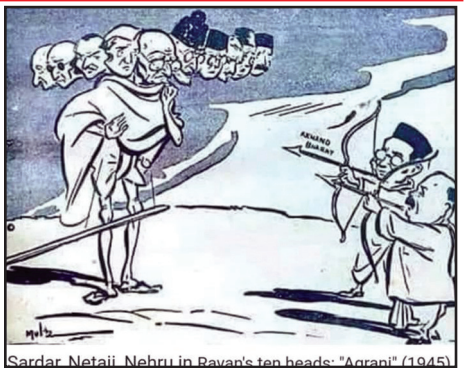

এই কার্টুনটি ১৯৪৫ সালে নারায়ণ আপ্টে (মহাত্মা গান্ধীর খুনিদের মধ্যে একজন) দ্বারা প্রকাশিত এবং গডসে দ্বারা সম্পাদিত হিন্দু মহাসভার মুখপত্রতত্র 'অগ্রণী'তে ছাপা হয়েছিল। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন গান্ধীজির দশ মাথার মধ্যে সর্দার প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু রয়েছেন।

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব ঃ নির্ভেজাল আনন্দ বনাম রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি

শারদোৎসব থেকে দীপাবলী—এক কথায় উৎসবের মরশুম চলছে পশ্চিমবাংলায়। এই উৎসবে নিজেদের মতো করে উপভোগ করার সাধ থাকে সকলেরই। কিন্তু সকলের সাধ্য থাকে না। সাধ্য থাকা আর সাধ্য না থাকার মধ্যে যে আর্থ-সামাজিক বিভাজন রেখা, তা খালি চোখেই দেখা যায় এতটাই স্পষ্ট। পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালের পরবর্তী পর্বে ভূমি সংস্কার, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার, গ্রাম ও শহরের মহিলাদের অসংখ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের কাজে সাফল্য—প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উৎসবে অংশগ্রহণের 'সাধ্য নেই' অংশের ভীর ক্রমশ কমেছে, ভীর বেড়েছে 'সাধ্য থাকা' অংশের। পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তথ্যপ্রযুক্তি হাব প্রভৃতি গড়ে তোলার কাজ সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে আরও অনেক মানুষ বিভাজন রেখা পেরিয়ে 'সাধ্য থাকা' অংশে চলে আসতে পেরেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় একবিংশ শতকের প্রথম দশকে আরও বহু শিল্প গড়ে উঠতে থাকে, এমনকি 'মাশুল সমীকরণ নীতি' ও 'লাইসেন্স প্রথার' ধাক্কায় এক সময় শিল্পে ধুঁকতে থাকা এই রাজ্য এক সময় শিল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাপকাঠিতে শিল্পে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির সাথে টক্কর দেওয়ার জায়গায়ও পৌঁছে যায়। ফলস্বরূপ উৎসবে অংশ নেওয়ার সাধ্য থাকা অংশে আরও বহু মানুষ চলে আসেন, যাঁদের এক সময় সেই সাধ্য ছিল না। এরপরেও যাঁদের কাছে উৎসবের আলোর রোশনাই পৌঁছোয় নি, তাঁদেরও একটা অংশকে টেনে তুলে আলোর বৃত্তে নিয়ে আসতে সাহায্য করে 'মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প' বা একশো দিনের কাজ। পৃথিবীর বৃহত্তম চাহিদা ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পটির পরিকল্পনাও কিন্তু তাঁদেরই মস্তিষ্ক প্রসূত, যাঁদের হাত ধরেই এই রাজ্যে ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।

প্রায় তিন দশক সময়ের মধ্যে 'সাধ্য না থাকার' একটা বড় অংশ 'সাধ্য থাকা'-র দিকে চলে আসতে পারলেন শুধু তাই নয়, যাঁদের আগেও কিছুটা হলেও সাধ্য ছিল, যেমন সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বা বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থার কর্মী, তাদের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটার ফলে, উৎসবকে উপভোগ করার সাধ্যও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। এক সময় পরিবার পরিজনকে নতুন পোশাক কিনে দেওয়ার মধ্যেই তাঁদের সাধ সীমায়িত থাকতে বাধ্য হত। কিন্তু সাধ্যের পরিসরটা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, নতুন পোশাকের সীমানা পেরিয়ে সাধও বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হল।

কোনো ঘটনাই অকস্মাৎ ঘটে না। প্রতিটি ঘটনারই কার্যকরণ সম্পর্ক থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রাজ্যের পরিসরে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে যখন উৎসবে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল, ঠিক তখনই ভীড়কে আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন সর্বজনীন পুজোমণ্ডপে সাবেকিয়ানা থেকে সরে এসে 'থিম' চালু হল। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই একজন দার্শনিক বলেছিলেন—আর্থিক ভিত্তিটা মজবুত হলে শিক্ষা, শিল্প, (আর্ট) ও সংস্কৃতিও পল্লবিত হওয়ার সুযোগ পায়। পশ্চিমবঙ্গে আলোচ্য তিন দশকে শুধু সাধ্যের পরিসরটা বৃদ্ধি পেল তাই নয়, শিক্ষার প্রসার, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা, সামাজিক কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনচেতনার স্তরেও ধীরে হলেও, একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটছিল, যার ছাপ পড়ছিল সর্বজনীন আয়োজনগুলিতেও। মাইকে কানে তালা লাগানো ভল্যুমে চটুল গান চালিয়ে হুল্লোর করার সংস্কৃতি একেবারেই অপসারিত হয়েছিল, এমন বলা যাবে না। তবে অনেকটাই স্তিমিত হয়েছিল। তবে এইজন্য তৎকালীন সরকারকে বারোয়ারি উদ্যোগে নাক গলাতে বা খবরদারি করতে হয়নি। সরকার তার কাজ করেছে। সব অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে সচেষ্ট থেকেছে। দৈনন্দিন জীবনের পাশাপাশি যার প্রভাব পড়েছে বিশেষ উৎসব কেন্দ্রীক গণ জমায়েতে ও গণউদ্যোগে।

তবে এই পর্বের এখানেই ইতি টানলে, প্রসঙ্গটি একপেশে অবতারণার দোষে দুষ্ট হতে পারে। কারণ এই সময়কালটিই ছিল আমাদের দেশে নয়া উদারবাদ পরিচালিত বিশ্বায়নের কিছুটা হলেও ফুলে ফেঁপে ওঠার সময়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাব-প্রাইম ঋণ সঙ্কটের ধাক্কা তখনও আসেনি। ফলে বিশ্বায়নের 'লেজিটিমেসি' তখনও প্রশ্নের মুখে পড়েনি। আর্থিক বৃদ্ধির সুফল চুঁইয়ে (ট্রিকল ডাউন থিওরি) একেবারে নিচের তলায় না পৌঁছোলেও, মধ্যবর্গের একটা অংশকে নিঃসন্দেহে আর্থিক সক্ষমতার দিক থেকে পূর্বের তুলনায় হৃষ্টপুষ্ট করে তুলেছিল। যাঁদের পোশাকি নাম হল 'নিও মিডল ক্লাস'। এই অংশের ভোগের বহুমুখীন চাহিদার যোগানদার হল দেশি-বিদেশী ছোট বড় ও পেল্লায় কোম্পানি। বিভিন্ন ধরণের পণ্যের বাজারে দখলদারি কায়েম করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত কোম্পানিগুলির বিজ্ঞাপনের ঢেউ শুধুমাত্র দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের পর্দা জুড়েই দেখা দিল তা নয়। জনপদের দু'ধারেও গা ঘেঁষাঘেষি করে উঁকি মারতে শুরু করল। চিরকালই বিকি-কিনির হাটে সব থেকে বেশি ভিড় হয় উৎসবকে কেন্দ্র করে। এটা ট্র্যাডিশন। বিশ্বায়ন পর্বে সম্বৎসর মার্কেটিং করা 'নিও মিডল ক্লাসের' ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ালেও, উৎসব কেন্দ্রীক বিশেষ কেনাকাটার ট্র্যাডিশনে কোনো ভাঁটা পড়ল না। ফলে পণ্য সরবরাহকারীরাও তাদের বিশেষ বিজ্ঞাপন দিয়ে (ওদের ভাষায় অফার) মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বেছে নিল যেখানে জনসমাগম বেশি সেই সর্বজনীন মণ্ডপগুলিকেই। বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে আয়োজনের পরিবর্তে বিভিন্ন স্পনসরারের আনুকূল্যে সর্বজনীন আয়োজন এই সময়ের একটা বৈশিষ্ট। রাজ্যে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই উপরিকাঠামোর এই পরিবর্তনগুলি ঘটেছে। তৎকালীন সরকার লক্ষ্য রেখেছে, কিন্তু হস্তক্ষেপ করেনি। উৎসবের আনন্দে নিশ্চিন্তে গা ভাসানোর জন্য যে পরিকাঠামো এবং শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ প্রয়োজন, রাজ্য সরকার শুধু সেটুকুই 'এনসিওর' করেছে। কারণ এটুকুই সংবিধান নির্দেশিত লক্ষণরেখা। যা অতিক্রম করে যাওয়া কোনো নির্বাচিত সরকারের কাছেই কাম্য নয়।

কিন্তু সবকিছুই ওলট-পালট হতে শুরু করল গত এক দশকে। ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার, স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রভৃতির সাফল্যের হাত ধরে রাজ্য অর্থনীতির যে অগ্রগতি ঘটেছিল, তার পশ্চাদপসরণ শুরু হল। ধ্বংস হল নির্মীয়মান শিল্পের সম্ভাবনাও। নির্মীয়মান গাড়ির কারখানার জমিতে সর্ষের চাষের গালগল্প হয়ে দাঁড়াল রাজ্যবাসীর ভবিতব্য। ইতোমধ্যে বিশ্বায়নও হোঁচট খেয়েছে। নিও মিডল ক্লাস বা নয়া মধ্যবিত্তের 'অ্যাব্রড'কে পাখির চোখ করার স্বপ্নও ধাক্কা খেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সাবপ্রাইম সঙ্কটের জেরে। এই সঙ্কটের ঢেউ সাগর পেরিয়ে আমাদের দেশের তীরে এসে জোর ধাক্কা মারলেও, টাল-মাটাল হতে হতেও, আমাদের দেশের অর্থনীতি যে তা অনেকটাই সামলে নিতে পারল, তাতে বড় কৃতিত্ব সেই বামপন্থীদেরই। কারণ বামপন্থীদের আন্দোলনের চাপেই ব্যাঙ্ক-বীমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার প্রচেষ্টা থাকলেও করা যায় নি। ফলে তখনও জি ডি পি বৃদ্ধি আর 'ট্রিকল ডাউন' তত্ত্ব বাজারে ভালোভাবেই বিকোচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত 'নিও মিডল ক্লাস' বিপদের আঁচ পেলেও কপালে ভাঁজ পড়ার মতো সঙ্কট তখনও ঘাড়ের ওপর এসে পড়েনি। এদিকে বিশ্বায়নের পক্ষে জোর কদমে ঢাক পেটানোর মধ্যেই, ধর্মীয় বিভাজন যাদের রাজনীতির লাইফ লাইন, তারাও শক্তিবৃদ্ধি করতে শুরু করল। ইতোমধ্যে 'সারফেস'-এ চলে এসেছে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির প্রসঙ্গ। দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের (কোনো সংগঠিত উদ্যোগ ব্যতিরেকে স্বতঃস্ফূর্ততা নির্ভর) মুখ আন্না হাজারের কাঁধে বন্দুক রেখে ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছাকাছি আসা এবং অবশেষে ক্ষমতায় আরোহণ ধর্ম ব্যবসায়ীদের। এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত ধরেই এল 'নোটবন্দী' ও তড়িঘড়ি পণ্য ও পরিষেবা (জি এস টি) চালু করার অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। ফলে সাবপ্রাইম সঙ্কটের ধাক্কা সামলানো অর্থনীতির কোমরটা গেল ভেঙে। তারপরে কোভিড-১৯, কোভিড রুখতে দীর্ঘ লকডাউন এবং সবশেষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেঁচে দেওয়ার হিড়িক। ভালোভাবেই ধাক্কা খেল জি ডি পি বৃদ্ধি আর ট্রিকল ডাউন তত্ত্বও।

জাতীয় অর্থনীতির গতি রুদ্ধ হলে তার প্রভাব রাজ্যের অর্থনীতিও গতি হারায়, এটা স্বাভাবিক। এর সাথে এ্যাডেড ফ্যাক্টর হিসেবে হাজির হল রাজ্য অর্থ ব্যবস্থা (কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা) পরিচালনায় সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। সব মিলিয়ে 'সাধ থাকলেও সাধ্য নেই' অংশে আবার ভিড় বাড়ছে। আপাতদৃষ্টিতে 'থিম', তাকে দেখার জন্য ভিড়, শহরের মুখ ঢেকে দেওয়া বিজ্ঞাপন, সবকিছুই আগের মতো থাকলেও ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সেই ভিড়ে বহু চেনা মুখ নেই। যাঁরা 'সাধ্য থাকা'র দল থেকে আবার ফিরে গেছে 'সাধ্য না থাকা'-র দলে। কিন্তু বিপদ এখানেই শেষ নয়। কারণ আর্থিক সঙ্কটের কারণে জীবন ও জীবিকার যে বিপন্নতা তৈরি হয়, তা থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই জন্ম নেয় ক্ষোভ। এই ক্ষোভ সংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত উভয় পথেই বেরিয়ে আসতে চায়। একে দমন করার জন্য স্বৈরচারী শক্তি দুটি অস্ত্র প্রয়োগ করে। ক্ষোভের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশকে দমন করার জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ এবং গণতন্ত্র সম্মত কার্যকলাপের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়। আবার স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে স্তিমিত করার জন্য কিছু চকচকে কিন্তু অন্তঃসার শূন্য প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়। এর বাইরেও থাকে আর একটা রাজনীতি। তা হল আমি ছাড়া গতি নেই বা 'কানু বিনা গীত নাহি' প্রমাণ করার জন্য সমস্ত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা। এমনকি যেখানে হস্তক্ষেপ সমীচিন নয়, সেখানেও। এই রাজনীতির যে লক্ষ্য থাকে, তাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিভাজনমূলক ক্রিয়াকলাপ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সমাজের অভ্যন্তরে গভীর বিভাজন সৃষ্টিতে সক্ষম এমন শক্তিকে এরা সবসময়েই প্রকাশ্যে অথবা আড়ালে স্বাগত জানায়। কারণ বিভাজনে দীর্ণ জমিতে স্বৈরাচারী কার্যকলাপের চাষ করতে সুবিধা হয়।

উপরোক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট আজকের পশ্চিমবাংলায় ৩৬৫ দিনই স্পষ্টত দৃশ্যমান। তাই উৎসবও তার বাইরে নয়। সর্বজনীন উদ্যোগগুলিকে সরকারী কোষাগার থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া থেকে শুরু করে কার্নিভাল সর্বত্রই নিয়ন্ত্রণের ছাপ রয়েছে। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা কিন্তু নয়। এই সমস্ত সংঘগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্যও থাকে। যার লক্ষণও পশ্চিমবাংলায় স্পষ্ট। কিন্তু দমন, নিয়ন্ত্রণ বা জনবাদী ঘোষণার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা—কোনো কিছুই জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানের দ্রুত অবনমনকে ঠেকাতে পারে না। কারণ একটাই—প্রকৃত জনস্বার্থবাহী নীতির অনুপস্থিতি। স্বৈরাচারের যেমন নীতি নেই। নৈতিকতাও নেই। তাই দুর্নীতি এদের অঙ্গের ভূষণ। এরা শুধু যে নিজেদের গায়ে দুর্নীতির পাঁক মাখে তা নয়, প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে সামাজিক বৈধতাও দিতে চায়। কিন্তু এত ধরনের কৌশল অবলম্বন করার পরেও, স্বৈরাচারীরা জনসমর্থনকে তাদের পক্ষে খুব বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না। জনসমর্থনের এই ক্ষয়কে রোধ করার জন্য তখন আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী শাসক। শুধু প্রতিবাদ দমনই নয়, তখন গঠনমূলক প্রগতিশীল ভাবনাও তারা মেনে নিতে পারে না। কারণ প্রগতিশীল ভাবনাই ভবিষ্যৎ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আঁতুর ঘর। আর প্রগতিশীল ভাবনায় জারিত চেতনার জন্ম হয় পুস্তক পাঠের মাধ্যমেই। তাই, খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্র এদের চক্ষুশূল এবং সেই কারণেই ভাঙচুর করে ভবিষ্যৎ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে চায়। স্বৈরাচারী শাসক যখন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে সংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত উভয় ধরনের প্রতিবাদকে দমন করার চেষ্টা করে, তখন সেই টালমাটাল পরিস্থিতিকে কাজে লাগায় উগ্র সাম্প্রদায়িক তথা ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি। তাদের বিভিন্ন ধরনের হিডন্ এজেন্ডা তখন সামনে চলে আসে। ঠিক যেমনটা ঘটেছে শারদোৎসব চলাকালীন। একটি সর্বজনীন মণ্ডপে অসুরের পরিবর্তে গান্ধীজীর মূর্তি বসানোর দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে গডসের উত্তরসূরীরা। এই বিষয়ে রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকের নীরবতা লক্ষণীয়। এই নীরবতার একমাত্র কারণ, যে কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক বা মূল্যবোধহীন কার্যকলাপ উভয়ের স্বার্থকেই সুরক্ষিত করে।

এক কথায় শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উপলক্ষে আয়োজিত মিছিল, কার্নিভাল, বুক স্টল ভাঙা, উৎসবের মরশুমেই চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবু শিক্ষকরা নিয়োগের দাবিতে রাস্তায় অবস্থান ও অনশন করলেও তাদের দিকে দৃকপাত না করা, এমনকি রাতের অন্ধকারে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া, গান্ধীজীর অবমাননা প্রভৃতি সব কিছুর মধ্য দিয়ে রাজ্য রাজনীতির বর্তমান নেতিবাচক প্রবণতাগুলিই ফুটে উঠেছে। কালক্ষেপ না করে এই সর্বনাশা 'নেতি'র বিরুদ্ধে উন্নত চেতনা সম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। না হলে এই রাজ্য আর্থিক দিক থেকে ভঙ্গুর হয়ে পড়বে বা সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হবে শুধু তাই নয়, নবজাগরণের পীঠস্থান এই রাজ্যের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিও একই সাথে লুম্পেনাইজেশনের শিকার ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। ইতোমধ্যে রাজ্য সেই সর্বনাশের ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করেছে। একে রোখার দায়িত্ব বহু সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খেটে খাওয়া মানুষের, যার অংশ আমরাও। সে কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। □

২৪ অক্টোবর, ২০২২

সারা রাজ্যে ব্লক ও অঞ্চল সম্মেলনগুলি থেকে নব নির্বাচিত সভাপতি ও সম্পাদকদের নামের তালিকা

পুরুলিয়া

ব্লকের নাম	সম্মেলনের তারিখ	সভাপতির নাম	সম্পাদকের নাম
আড়ষা	১৩/০৯/২০২২	কমঃ লুলেশ্বর হাঁসদা	কমঃ তপন চট্টরাজ
মানবাজার-১	১৪/০৯/২০২২	কমঃ প্রবাল সরকার	কমঃ অরিন্দম দাস
মানবাজার-২	১৩/০৯/২০২২	কমঃ বিকাশ চক্রবর্তী	কমঃ মানিকলাল দত্ত
পাড়া	১৪/০৯/২০২২	কমঃ নিশাকর মণ্ডল	কমঃ তরুন ঘোষ
বাগমুন্ডি	১৫/০৯/২০২২	কমঃ স্বপন গোপাল মুখার্জী	কমঃ সুখেন্দু চট্টরাজ
হুড়া	১৪/০৯/২০২২	কমঃ স্বদেশ রঞ্জন মণ্ডল	কমঃ অনুপ কুমার শেঠ
বান্দোয়ান	১৪/০৯/২০২২	কমঃ সত্যজিৎ পতি	কমঃ সুভাষচন্দ্র হেমব্রম
ঝালাদা-২	১৬/০৯/২০২২	কমঃ সুপ্তি সহিস	কমঃ দেবনাথ সিন্‌হা
বরাবাজার	২১/০৯/২০২২	কমঃ কমল মাহাত	কমঃ বিমল সরেন
ঝালদা-১	১৬/০৯/২০২২	কমঃ রাজেশ গোস্বামী	কমঃ রুপালী শাখারী
পুরুলিয়া-১	২১/০৯/২০২২	কমঃ রামচন্দ্র মাঝি	কমঃ মদন মোহন রাজোয়াড়
জয়পুর	২৩/০৯/২০২২	কমঃ বিশ্বনাথ কুইরী	কমঃ পার্থপ্রতীম চ্যাটার্জী
নেতুড়িয়া	২৭/০৯/২০২২	কমঃ অমিতেষ রায়	কমঃ দয়াময় পরামানিক

মালদা

ব্লকের নাম	সম্মেলনের তারিখ	সভাপতির নাম	সম্পাদকের নাম
হরিশ্চন্দ্রপুর-১	১২/০৯/২২	উজ্জ্বল ভট্টাচার্য	শুভঙ্কর চক্রবর্তী
হরিশ্চন্দ্রপুর-২	১৪/০৯/২২	বরুণ পাখিরা	রিপন সরকার
রতুয়া-২	২১/০৮/২২	অরুণ কুমার কর্মকার	জামাল হোসেন
কালিয়াচক-১	২৮/০৯/২২	গৌরাঙ্গ দাস	পরেশ শীল
কালিয়াচক-২	২৫/০৮/২২	——	মতিউর রহমান
কালিয়াচক-৩	২৭/০৯/২২	মহঃ জাহিরুদ্দিন	———
হবিবপুর	০৮/০৯/২২	নচিকেতা কাহালি	চন্দন ব্যানার্জী
বাশেন গোলা	২৪/০৮/২২	সমির দাস	শম্পা চৌধুরী
গাজোল	২৮/০৮/২২	বিপ্রদেব রায়	শিখা ঘোষ
উত্তর অঞ্চল	২৫/০৯/২২	বিভূতি মণ্ডল	শৈবাল ভট্টাচার্য
মধ্য অঞ্চল	২৭/০৯/২২	সুপ্রিয় কুমার দাস	——
কালেক্টরেট অঞ্চল	২৫/০৯/২২	বিকাশ সরকার	সামুয়েল মূর্তি
দক্ষিণ অঞ্চল	২২/০৯/২২	উত্তম কুমার ঘোষ	তুষাণ কান্তি মণ্ডল
হাসপাতাল অঞ্চল	২১/০৯/২২	বলরাম রজক	পঙ্কজ দাস

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস্-এর ১৮তম কংগ্রেস

কর্দমাক্ত পুঁজিবাদ থেকে ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন

কে. হেমলতা
(সভাপতি, সি আই টি ইউ)

৬-৮ মে, ২০২২, ইতালির রাজধানী শহর রোমে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস্-এর অষ্টাদশ কংগ্রেস দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে যে, কর্ম ও সংগ্রামমুখর বিশ্বই হল ভবিষ্যৎ। এই কংগ্রেস বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেণী সংগ্রাম ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ওপর ভরসা রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বিপ্লবী কবি ভ্লাদিমির মায়োকভস্কির লেখা কবিতার লাইন উদ্ধৃতি করে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে, 'ভবিষ্যৎ নিজে থেকেই আবির্ভূত হবে না'। একে পুঁজিবাদের পাঁক থেকে টেনে বের করতে হবে, কারণ শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ পুঁজিবাদ হতে পারে না।

আবিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও, প্রত্যয় ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৮তম কংগ্রেস। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং এই সংগ্রাম আন্দোলনগুলিতে শ্রমিকদের, বিশেষত যুব বয়সী এবং মহিলা শ্রমিকদের বর্ধিত সংখ্যায় অংশগ্রহণই প্রতিফলিত হয়েছে প্রত্যয়ের মধ্যে। কংগ্রেসের স্লোগান ছিল, ''ঐক্যবদ্ধ হও, এগিয়ে চল। সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের তাগিদে!''

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এখনও কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত সমস্যা ও অনিশ্চয়তা থাকার কারণে, ডব্লু এফ টি ইউ কংগ্রেস সংকর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যে ১৩৩টি দেশে ডব্লু এফ টি ইউ-র উপস্থিতি রয়েছে, তার মধ্যে ৯৩টি দেশ থেকে ৪৩০ জন প্রতিনিধি ১৮তম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ৩৩০ জন শারীরিকভাবে এবং ১০০ জন 'ভার্চুয়ালি' অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইংরাজি ও স্পেনীয় ভাষায় ডব্লু এফ টি ইউ-র নিজস্ব সঙ্গীতের পরে কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রতিবেদন ভিডিয়োর মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। আয়োজক সংগঠন ইউনিয়নি সিন্ডাকেল ডি বেস (ইউ এস বি)-এর সাধারণ সম্পাদক পিয়েরপাওলো লিওনার্দি স্বাগত ভাষণ দেন। ডব্লু এফ টি ইউ-র সভাপতি মাইকেল জাওয়ানডিল ম্যাকাইবা কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন ডব্লু এফ টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক জর্জ মাভ্রিকোস।

কংগ্রেসের 'নিবন্ধ ও অগ্রাধিকার' শীর্ষক মূল প্রতিবেদনটি প্রতিনিধিদের সুপারিশ প্রদানের জন্য আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাভ্রিকোস তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে সাম্প্রতিক সময়ে ডব্লু এফ টি ইউ-র যে অগ্রগতি ঘটেছে এবং সংগঠনের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হল—বর্তমানে সবক'টি মহাদেশের ১৩৩টি দেশে ডব্লু এফ টি ইউ-র প্রায় ১০ কোটি ৫০ লক্ষ সদস্য রয়েছে। মাভ্রিকোস বলেন এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদী ধারণার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম, যুথবদ্ধতার মাধ্যমে, নিচুস্তরের ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন, এবং পরিস্থিতির পর্যালোচার প্রশ্নে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতির মধ্যেমে। ডব্লু এফ টি ইউ-র ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়তই, ভবিষ্যৎ গঠনের সম্পদ ও হাতিয়ার। ডব্লু এফ টি ইউ-র কংগ্রেসে প্রদত্ত স্লোগান 'তৎপরতা-তৎপরতা-তৎপরতা' ডব্লু এফ টি ইউ-কে নতুন জীবন প্রদান করেছে এবং শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ধরনের ধারাবাহিক তৎপরতা এর বিস্তারের প্রশ্নে বিপুল অবদান রেখেছে।

শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা যাবে না। যাঁরা সত্যিই ঐক্য চান এবং যাঁরা একে ঘৃণা করেন কিন্তু ঐক্যের ভান করেন—এই উভয়পক্ষই 'ঐক্য' শব্দটিকে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করে ফেলেছেন। ঐক্য কোনো 'ফাঁকা আওয়াজ' নয়। উদাহরণ স্বরূপ প্যালেস্তিনীয়রা তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য ঐক্য ও আন্তর্জাতিক সমর্থনের আবেদন জানায় আবার ইসরায়েলও প্যালেস্তিনীয়দের জেরুজালেম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঐক্য ও আন্তর্জাতিক সমর্থনের আবেদন জানায়। আমরা

কিউবার প্রতি সংহতি জানিয়ে ঐক্যের কথা বলি, আবার আমেরিকা সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ঐক্যের কথা বলে। তাই কার সাথে ঐক্য, কিসের লক্ষ্যে ঐক্য এটা বিবেচনা করা খুব জরুরি।

ঐক্য হতে হবে শ্রেণি ঐক্য। কৃষক সমাজ ও প্রগতিশীল শক্তি যারা শ্রমজীবীদের স্বার্থে কাজ করছেন, তাঁদের সাথে শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য। পুঁজিবাদী শোষণের অবসানের লক্ষ্যে এই ঐক্য গড়ে উঠবে।

বিপরীতে সংস্কারবাদী এবং তথাকথিত 'নিরপেক্ষদের' মেকী ঐক্য শ্রেণী সমন্বয় ও পুঁজিবাদকে মানবিক করার নামে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা করে। ডব্লু এফ টি ইউ কখনই নিরপেক্ষ ছিল না। শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির লক্ষ্যে এই সংস্থা সম্পূর্ণত দায়বদ্ধ। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদীরা ডব্লু এফ টি ইউ-কে ভয় পায়। ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন ডব্লু এফ টি ইউ-র সভাপতি গিসেপ ডি ভিট্টোরিওকে দেশে ঢোকার অনুমতি দেয়নি; ২০১৮ সালে একইভাবে সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় দায়বদ্ধতার কারণেই ডব্লু এফ টি ইউ-কে হয় শ্রদ্ধা করতে হবে, না হয় ভয় পেতে হবে। তৃতীয় কোনো রাস্তা নেই।

প্রায় সমস্ত দেশেই শ্রমজীবীদের যে লড়াই-সংগ্রাম চলছে তা থেকে কিছু ফলও পাওয়া গেছে। এই সংগ্রাম আন্দোলন না থাকলে মজুরি শ্রমিকদের আরও বেশি ক্ষতি হত। তাছাড়াও এই সংগ্রামের ফলেই কিছুটা হলেও শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, বেসরকারীকরণ অনেকটাই বন্ধ করা গেছে, ছাঁটাই ও বরখাস্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হল, শ্রমজীবীরা উত্তরোত্তর বুঝতে পারছে যে শ্রেণি ভিত্তিক সংগ্রামই তাদের আসল জোরের জায়গা। শ্রমজীবীরা ও সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। শ্রমজীবীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে এটা বুঝতে পেরে শোষণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন, এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আরও বেশি সচেতন, জঙ্গী ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

এই প্রেক্ষাপটেই ডব্লু এফ টি ইউ-র অষ্টাদশ কংগ্রেস তার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল—শ্রমিকশ্রেণির আশু চাহিদা পূরণের জন্য ধারাবাহিক সংগ্রাম-অন্দোলন গড়ে তোলা, যেমন—বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, ব্যবহারযোগ্য বাড়ি, স্বচ্ছ পানীয় জলের সুবিধা, নিরাপদ, বিশ্বাসযোগ্য ও সুলভ সরকারী পরিবহন ব্যবস্থা এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা। আজকের দিনে যখন প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতি ঘটছে এবং পুঞ্জীভূত সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন আশু চাহিদার উর্ধ্বসীমাও বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। নতুন প্রযুক্তি ও ডিজিটাইজেশনকে শ্রমজীবীদের জীবনমানের উন্নতি ঘটানোর জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন, মুনাফা বৃদ্ধি করার জন্য নয়।

ডব্লু এফ টি ইউ ধারাবাহিকভাবে কর্মদিবস কমানোর জন্য লড়াই করছে। একইসাথে লড়াই করছে মজুরি বৃদ্ধির জন্য। আশু দাবি হল সপ্তাহে ৫ দিন ও ৩৫ ঘণ্টা শ্রম সময়। পরবর্তী ধাপের দাবি হবে সপ্তাহে ৪ দিন ও দিন পিছু ৭ ঘণ্টার শ্রম সময়। এবং এই দাবি অর্জন করতে হবে মজুরি হ্রাস না করেই। ডব্লু এফ টি ইউ-র অনুমোদিত সংগঠনগুলি পূর্ণ সময়ের স্থায়ী কাজ, সম্মানজনক মজুরি, সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও পেনশনের সুযোগ, বেসরকারীকরণ ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নিরাপত্তার দাবি, শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে তাদের ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলন জারি রাখবে। ধর্মঘটের অধিকার বা শ্রমিক শ্রেণীর অপরিহার্য অধিকার—তাকে রক্ষা করার জন্যও লড়াই চালাতে হবে।

ডব্লু এফ টি ইউ-র ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি স্বদেশ দেব রায়ের উত্থাপিত রোম ঘোষণাপত্রকে অষ্টাদশ কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, পুঁজিবাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাঠামোগত সঙ্কটের মধ্যে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে সঙ্কটের মূল কারণ নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রগুলির মধ্যে, মাত্রাতিরিক্ত পুঞ্জীভূত পুঁজির পুনর্ব্যবহার ও পুনর্বিনিয়োগ না করতে পারার কারণে। এর ফলে পুঁজিপতিদের মুনাফার উদগ্র লালসা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। পুঁজিবাদী সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবীদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বা জনসাধারণকে কৃচ্ছ সাধন করতে বলে, পুঁজিবাদী পথেই এই সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যদিও পুঁজিপতি শিবিরের কাছে এই সঙ্কট শ্রমিক বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে।

রোম ঘোষণাপত্রে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাজার, শক্তির উৎস এবং পণ্য চলাচলের পথকে কেন্দ্র করে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী জোটের মধ্যেই থাকা রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, যা এখন সাম্রাজ্যবাদী জোটের স্বার্থসিদ্ধির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে এই বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। চীন বিরোধী নয়া জোট, যেমন AUKUS যার সদস্য রাষ্ট্র হল ইউ এস, ইউ কে এবং অস্ট্রেলিয়া এবং QUAD, যেখানে রয়েছে ইউ এস, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত—গড়ে তোলা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সামরিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবিশ্ব সামরিক খাতে বরাদ্দ এই প্রথম ২০২১ সালে দুই ট্রিলিয়ান ডলারের অঙ্ক অতিক্রম করেছে। সুইডেন ও 'ফিনল্যান্ড'-র মতো এযাবৎকাল নিরপেক্ষ হিসেবে চিহ্নিত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য 'ন্যাটো' আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার অন্যতম কারণ 'ন্যাটো'-র সম্প্রসারণের পরিকল্পনা।

ডব্লু এফ টি ইউ-র অষ্টাদশ কংগ্রেস পুনরায় প্যালেস্তিনীয় ও কিউবার জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়েছে। কিউবার ওপর চাপিয়ে দেওয়া মার্কিন অবরোধের নিন্দা করেছে, এবং কিউবাকে গুয়েন্তানামো ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। লাতিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, ব্রাজিল সহ যে সমস্ত দেশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাদের প্রতি সংহতি জানিয়েছে। এই সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে শুরু হওয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করে অষ্টাদশ কংগ্রেস ইরান ও সিরিয়ার জনগণের প্রতিও সংহতি জানিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পরে যাঁরা আন্তর্জাতিক শান্তি সুনিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাদের উপহাসও করেছে অষ্টাদশ কংগ্রেস।

যুগোশ্লাভিয়া এবং বর্তমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ—ইউরোপের এই দুই যুদ্ধ, ইরাক, আফগানিস্তান, মালি, লিবিয়া, সিরিয়া আজারবাইজান প্রভৃতি যুদ্ধ উপরোক্ত দাবির অসারতা প্রমাণ করে। এর থেকে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না যে, শ্রমজীবী সহ সাধারণ মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদ একটা বিপদ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয়ই প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তির উৎস, বন্দর, সমুদ্র প্রভৃতি সহ গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক এলাকার দখলদারির জন্য। অষ্টাদশ কংগ্রেস রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার দাবি জানানোর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর জন্য দায়ি ন্যাটোকে ভেঙে দেওয়ার দাবিও জানিয়েছে। ১৯৮০-র দশকে গৃহীত সিদ্ধান্তের পুনর্নবীকরণ করে ডব্লু এফ টি ইউ-র কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর দিনটিকে পৃথিবীর দেশে দেশে আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর জন্য সংগ্রামের দিন হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের পক্ষ থেকে প্রতিপালন করা হবে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাৎসি জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল।

সাধারণ সম্পাদক উত্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর মোট ৯০ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন অনলাইন আলোচনায় অংশ নেন। সি আই টি ইউ-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন হেমলতা। সি আই টি ইউ-র সভাপতি হেমলতা এবং জাতীয় সম্পাদকত্রয় স্বদেশ দেবরায়, এলামারাম করিম এবং অনাদি সাহু সহ মোট চারজন সি আই টি ইউ-র পক্ষ থেকে সশরীরে অষ্টাদশ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সি আই টি ইউ-র পক্ষে আরও ১৫ জন প্রতিনিধি অনলাইনে অংশ নেন। সি আই টি ইউ-র আরও এক জাতীয় সম্পাদক প্রশান্ত নন্দী চৌধুরী টি ইউ আই (শক্তি)-র পক্ষ থেকে কংগ্রেসে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

অষ্টাদশ কংগ্রেসের শেষদিনে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। সম্মানীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন জর্জ মাভ্রিকোস। দক্ষিণ আফ্রিকার মাইকেল মজওয়ানডিলে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলী, সহ সভাপতি এবং ফিনান্স কন্ট্রোল কমিশনকে নির্বাচিত করা হয়। নিখিল সাইপ্রাস লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পাম্পিস কিরিটসিস্ ডব্লু এফ টি ইউ-রও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদকমণ্ডলীতে ১০টি দেশের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং ফিনান্স কন্ট্রোল কমিশনে রয়েছে ৭টি দেশের প্রতিনিধিত্ব।

স্বদেশ দেবরায় অন্যতম সহ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন। হেমলতা নির্বাচিত হন অন্যতম সহ সভাপতি হিসেবে। □

অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ

যুদ্ধের অন্তরালে ছায়া যুদ্ধই মুখ্য

মানুস কুমার বড়ুয়া

দেখতে দেখতে আট মাস পার হয়ে গেল ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলছে। চলতি বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনকে প্রথম আঘাত হানে রাশিয়া। এরপর দীর্ঘসময় ধরে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ পর্ব, বা কখনও সাময়িক যুদ্ধ বিরতি পর্ব চলছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষের কোনো ইঙ্গিত আজও পাওয়া যায়নি। পরিনামে নারী-শিশু সহ হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ নিহত, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছে।

ইউক্রেন-রাশিয়ার সম্পর্ক শত শত বছরের পুরানো। ইউক্রেন অতীতে জার সাম্রাজ্যের এবং অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরী সাম্রোজ্যের অধীনে শোষিত ও শাসিত হয়েছে। জার সাম্রাজ্যের শাসনকালে ইউক্রেনীয় জাতীয়সত্ত্বার বিকাশে এবং ভাষার ব্যবহারে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল। লেনিনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের ফলে শঙ্কিত জার শাসনবর্গ কিছুটা পিছু হটলেও বিপ্লবের ব্যর্থতার পরিণামে আবার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যায় তারা। পরবর্তীকালে লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ইউক্রেন স্বেচ্ছায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইউক্রেনীয় ভাষা ও জাতিসত্ত্বার বিকাশ ঘটার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এতদসত্ত্বেও ইউক্রেনে বসবাসকারী রুশ জাতিসত্ত্বার মানুষের সংখ্যা কম ছিল না বা এখনও কম নেই। রুশদের সাথে ইউক্রেনীয় জাতিসত্ত্বার একটা অন্তঃসলিলা সংঘাতের ধারা বহমান ছিল বরাবর। ক্রমশ রুশ ভাষা ইউক্রেনে প্রভাবশালী ভাষা হয়ে ওঠে। একটি গবেষণা বলছে ১৯৩০ সালে ইউক্রেনের বিদ্যালয়গুলিতে ৮৯ শতাংশ ছাত্র ইউক্রেনীয় ভাষা ব্যবহার করত, ১৯৪৪ সালে তা ২৯ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। বর্তমানে ইউক্রেন একটি বহুজাতিক দেশ। রুশ, পোল ছাড়াও ইহুদী ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতি এখানে বসবাস করে। বর্তমানে রুশ ভাষীর হার প্রায় ১৭ শতাংশ, ইউক্রেনীয় ভাষীর হার ৭৭ শতাংশ। পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনে রুশ জাতিসত্ত্বার মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অঞ্চলটি বড় বড় শিল্প-কারখানা এবং মূল্যবান খনিজদ্রব্য সমৃদ্ধ। অপরদিকে ইউক্রেনের মধ্য ও পশ্চিম অংশে ইউক্রেনীয় জাতিসত্ত্বার সংখ্যাধিক্য। এই অংশটি মূলত গ্রামাঞ্চল এবং এখানকার মানুষ মূলত কৃষিনির্ভর। তবে ২০০৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ভাষা ও জাতিগত বিভাজন খানিকটা হ্রাস পায়। বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐ সময়কালে দ্বিভাষী (ইউক্রেনীয় ও রুশ) মানুষের হার বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.৩ শতাংশে। ইউক্রেনীয় ও রুশ জাতিসত্ত্বার মধ্যে বিবাহ বৃদ্ধি পায় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, কর্মক্ষেত্রে উভয় ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। এতদসত্ত্বেও জাতি সমস্যা হল ইউক্রেনের এক জ্বলন্ত সমস্যা। এর সাথে অর্থনৈতিক দূরবস্থা যুক্ত হয়ে বর্তমানে বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক দূরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ হল ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে ইউক্রেনের শাসকদলের পশ্চিমী ঘেষা ধনীক তোষণ নীতি। এর ফলস্বরূপ জাতিগত ও ভাষাগতভাবে ইউক্রেন মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল এবং পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল এই দুই ভাগে আড়াআড়িভাবে বিভাজিত হয়ে গেছে।

১৯৯১ সালে বর্তমান ইউক্রেন গঠিত হবার পর ইউক্রেনের সম্পদ, কলকারখানা, খনি, কৃষিজমি ইত্যাদি লুটেপুটে নেয় ধনকুবেররা। সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সংস্থাগুলি ইউক্রেনের অর্থনীতিকে দিশা দেখানোর ছলে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। এই ভ্রান্ত পথ অনুসরণ এবং ধনকুবেরদের যথেচ্ছ লুঠতরাজের ফলে ইউক্রেনের অর্থনীতিতে ধস নামে। বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটে ব্যাপক হারে। ২০১০ সালে ইউক্রেনের ২৫ শতাংশ মানুষ ছিল দারিদ্রসীমার নিচে। ঐ সময়ে ১২ জন ধনকুবেরের দখলে ছিল জিডিপির ২০ শতাংশ। ১৯৯০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ইউক্রেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের তুলনায় শুধুমাত্র নিম্নতমই নয়, তা সমগ্র বিশ্বের নিচের দিকের পাঁচটি দেশের সমতুল্য হয়ে যায়।

ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ বৃহদাকার শিল্পগুলির অধিকাংশ পূর্ব দিকের ডনেৎস্ক ও লুহানস্ক প্রদেশে কেন্দ্রীভূত। এই প্রদেশগুলি ডনবাস নামে পরিচিত। সেখানে ২০১৪ সাল থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ রুশভাষীদের বিদ্রোহ চলছে। ইউক্রেনে ২০১৪-তে ইউরো-মাইদান ক্যু-এর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। ডনেৎস্কের জনসংখ্যার মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি হল রুশভাষী, লুহানস্কে তা ৭০ শতাংশের বেশি। এই দুটি প্রদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এবং জার আমল থেকে ভারি শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। জার আমলে রাশিয়া থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা এখানে স্থানান্তরিত হয়। সেই থেকেই ডনবাসে রুশ মানুষ সংখ্যাগুরু।

ইউক্রেনের ৩০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। মোট বসবাসকারীর ১৪ শতাংশ মানুষ কৃষিতে যুক্ত। শিল্পে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ রপ্তানি হয় রাশিয়াতে, যার বড় অংশ হল শিল্পজাত দ্রব্য। আবার ইউক্রেনের মোট আমদানির ৩৫ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে। যার মধ্যে আছে ইউক্রেনের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের ৬০ শতাংশ। এছাড়া আছে আরও নানান সামগ্রী। ইউক্রেনের মধ্যে দিয়ে

প্রবাহিত হয়েছে রাশিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইন। ইউরোপে রাশিয়া যে গ্যাস রপ্তানি করে তার ৮০ শতাংশ প্রবাহিত হয় ইউক্রেনের বুকের ওপর দিয়ে। এর জন্য ইউক্রেনের বেশ কিছু আয় হয়। অর্থাৎ ইউক্রেনের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাশিয়ারে উপর নির্ভরশীল। তার উপর রাশিয়ার কাছে ইউক্রেনের ৩০০ কোটি ডলারের শোধ না হওয়া ঋণ রয়েছে। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার হয় যে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ইউক্রেনের লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর বেশি। তাহলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে কেন?

ইউক্রেন-রাশিয়ার এই যুদ্ধ আসলে সাম্রাজ্যবাদী রণকৌশলের একটি পর্যায়। ভূরাজনৈতিক দিক দিয়ে ইউক্রেনের অবস্থান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তার উপর ইউক্রেনকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে রাশিয়াকে চাপে রাখা যাবে। এইসব কারণেই ২০০৪ ও ২০১৪ সালে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে ইউক্রেনে দুটি ক্যু সংগঠিত হয়। ২০০৪ সাল থেকে সাম্রাজ্যবাদের মদতেই এখানে দক্ষিণ পন্থী, চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি এবং নিও ফ্যাসিস্টদের জমি তৈরি করা হতে থাকে। ইউক্রেনের অভ্যন্তরে ভাষা ও জাতিসত্ত্বার দীর্ঘকালীন বিভেদের যে বীজ রোপিত আছে তাকে ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত সুকৌশলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই ইউক্রেন পশ্চিম ইউরোপ ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির চক্রব্যূহে পড়তে শুরু করে। আজকের পরিণতির অতীত ইতিহাসটা সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জারি ছিল দীর্ঘস্থায়ী ঠাণ্ডা যুদ্ধ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের টার্গেট ছিল সোভিয়েত প্রভাবাধীন বিভিন্ন দেশগুলির উপর থেকে সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব খর্ব করা। এই কাজে প্রথম দিকে কাজে লাগানো হত সি আই এ-র নেটওয়ার্ক। ১৯৮৩ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন বিশ্বজুড়ে 'গণতন্ত্র রপ্তানী' করতে সৃষ্টি করেছিলেন ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রাসি বা এন ই ডি নামক সংস্থা। এই এন ই ডি-র অধীনে আছে কয়েকশত অসরকারী সংস্থা বা এন জিও। প্রকৃতপক্ষে সি আই এ-র সব কুখ্যাত শাখা সংস্থাগুলির গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল সেই সময়। তাই বেছে নেওয়া হয় এন ই ডি-র ছত্রছায়ায় থাকা এন জি ওর মতো আপাত অরাজনৈতিক ও নিরীহ সংস্থাগুলিকে। এন ই ডি-র প্রথম প্রেসিডেন্ট অ্যালেন ওয়াইনস্টাইন বলেছিলেন, "আমরা যে এত কাজ করে চলেছি, সে কাজগুলি আগে করত সি আই এ"। ১৯৯৯ সালের আগে এন ই ডি-কে প্রদত্ত ৯৭ শতাংশ অর্থ আসত মার্কিন প্রতিষ্ঠান ইউ এস আই এ থেকে, এখন আসে ইউ এস এ আই ডি থেকে। বাকিটা আসে ব্রাডলি ফাউন্ডেশন, হোয়াইট ফাউন্ডেশন, ওলিন ফাউন্ডেশন এবং জর্জ সোরোসের মতো ধনকুবেরদের বিভিন্ন ফাউন্ডেশন থেকে।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ভেঙে যাওয়ার আগে এন ই ডি সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলি পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, তাইওয়ান, চিলি, নামিবিয়া ইত্যাদি দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্পন্ন করার পাঠ দিয়েছে। সেভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর এদের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলি উপর থেকে রাশিয়ার প্রভাব পুরোপুরি নির্মূল করা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য এই সংস্থাগুলি ব্যবহৃত হতে লাগল। ততদিনে বিশ্বজুড়ে নয়া উদার আর্থিকনীতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সাম্রাজ্যবাদ। ইউক্রেন সহ সোভিয়েত ভেঙে তৈরি হওয়া অন্যান্য দেশগুলিতে ক্ষমতাসীন যারা হল তারা মূলত ধনকুবের। তারা লুটপাট করে অর্থনীতিকে ফোঁপড়া করল। বহুজাতিক সংস্থাগুলি যে ব্যাকরণ মেনে বিভিন্ন দেশে লগ্নি করতে চায় তারা অনুকূল পরিবেশ এই দেশগুলিতে অনুপস্থিত ছিল। ১৯৯০ সালে বুলগেরিয়ার শাসকদের পাল্টে ফেলে সেখানে পশ্চিমী গণতন্ত্র রপ্তানি করা হল। যুগোশ্লাভিয়ার মতো দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, ক্ষেপনাস্ত্র ও বোমা মেরে তাদেরকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হল। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কেউ কেউ পুঁজিবাদী প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করে নিল (যেমন চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী)। অন্যত্র এনজিও-গুলিকে ব্যবহার করে 'রঙীন বিপ্লব' ঘটিয়ে পালা বদল করা হল। জর্জিয়ায় ঘটানো হল 'গোলাপ বিপ্লব', কিরগিজস্তানে 'টিউলিপ বিপ্লব' এবং ২০০৪-০৫ সালে ইউক্রেনে ঘটানো হল 'কমলা বিপ্লব'।

১৯৯৭ সালে আমেরিকান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জিগনিউ ব্রেজিনস্কি একটি বই লেখেন, যার নাম ছিল, 'দ্য গ্রেট চেসবোর্ড : আমেরিকান প্রাইমেসি অ্যান্ড ইটস্ জিও স্ট্র্যাটেজিক ইমপ্যারেটিভস্'। তাতে তিনি লেখেন—'ইউক্রেন ইউরোপীয় দাবা বোর্ডে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, একটি ভূরাজনৈতিক ঘুঁটি, কেন না স্বাধীন দেশ হিসাবে তার অবস্থান রাশিয়াকে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবে। ইউক্রেন ছাড়া রাশিয়া একটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্য হিসাবে তার মর্যাদা হারাবে... যদি ইউক্রেনের ওপর সে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারে তারা ৫ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ও মুখ্যসম্পদ এবং উপরন্তু কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ সহ রাশিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সম্বল ফিরে পাবে এবং এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য হয়ে উঠবে।' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে ইউক্রেন যে একটি দাবার ঘুঁটি তা এই ভাষ্য থেকে পরিষ্কার।

২০০৪ সালে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছিল। ঐ সময়ে রাষ্ট্রপতি ছিলেন লিওনিদ কুচমা। নির্বাচনের পূর্বে রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তান মিলে 'কমন ইকনমিক স্পেস' নামে একটি চুক্তি করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয় চারটি দেশ মুক্ত বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করবে, সম কর কাঠামোয় আসবে ইত্যাদি। কুচমার সঙ্গে পুতিনের একটি জ্বালানী চুক্তি হয়েছিল, যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক পরিকল্পনাকে নিস্ফল করে দেয়। কাস্পিয়ান সাগর থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত একটি তেলের পাইপ লাইন নির্মাণ করার আমেরিকান পরিকল্পনা ঐ চুক্তির ফলে বড়সর ধাক্কা খায়। তাই ইউক্রেনের মসনদে একজন জো হুকুম সরকার বসানোর ষড়যন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

২০০৪ সালে কুচমার মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ছিল ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার (ই ইউ সহ) ঘোড়া ছিল ভিক্টর ইয়ুকাচেঙ্কো। প্রসঙ্গত ইয়ানুকোভিচ ও ইয়ুকাচেঙ্কো দুজনেই ছিলেন ধনকুবের। প্রথম জন ইউক্রেনের পূর্ব অংশের, দ্বিতীয় জন পশ্চিমের। নির্বাচনে সরাসরি মাঠে নেমে পড়ে ইউক্রেনস্থিত আমেরিকা ও কানাডার রাষ্ট্রদূত। তা সত্ত্বেও নির্বাচনে সামান্য ব্যবধানে জয়লাভ করে ইয়ানুকোভিচ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে নির্বাচন কারচুপির অভিযোগ করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিক্ষোভ ম্যানুফ্যাকচার করা হয় এবং সেই বিক্ষোভে মদত দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সমাবেশগুলিতে অর্থ সরবরাহ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। বিক্ষোভকারীরা কমলা রঙের পোশাক পরে বিক্ষোভে সামিল হয়। তাই একে 'কমলা বিপ্লব' বলা হয়। বিক্ষোভের চাপে সুপ্রিম কোর্ট পুনর্নির্বাচনের রায় দেয়। পুনর্নির্বাচনের পূর্বে এক্সিট পোলকে হাতিয়ার করে জনগনকে বিভ্রান্ত করা হয়। জয়ী হন ইয়ুকাচেঙ্কো। এই তথাকথিত 'কমলা বিপ্লবে' মদত দিয়েছিল শতাধিক এনজিও। এন ই ডি এবং ইউ এস এ ই ডি-র মতো দক্ষ ও কুখ্যাত সংস্থা। ২০১২ সালে ইয়ুকাচেঙ্কো সরকারের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ওলি রাইবাচুক ফিনান্সিয়াল পোস্টকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমাদের হাতে ১৫০টি এন জি ও আছে, যারা সবকটি শহরে ছড়িয়ে গেছে। কমলা বিপ্লব ছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। আমরা অবার এরকম কিছু চাই, আমরা মনে করি তা সম্ভব।' এই সাক্ষাৎকারের দু'বছর আগে ইয়ুকাচোঙ্কোকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল ইয়ানুকোভিচ। তবে ততদিনে ২০০৪-এর ইয়ানুকোভিচের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক বদল ঘটে গিয়েছে।

২০১৩ সালে রাষ্ট্রপতি ইয়ানুকোভিচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যোগদানের চুক্তি নিয়ে আলোচনা এবং ন্যাটোয় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচেষ্টা নিতে শুরু করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়া এই উদ্যোগ ভালোভাবে দেখছিল না। বস্তুত পূর্ব ইউরোপের মূলত পূবর্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ১৯৯০-এর দশকে থেকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করার জোরদার প্রয়াস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গ্রহণ করে এবং অনেকাংশেই সফল হয়। ২০০৮ সালে ইউক্রেন ও জার্জিয়াকে ন্যাটোভুক্ত করার প্রাথমিক প্রস্তাব ন্যাটো গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে রাশিয়া ইউক্রেনকে ১৫০০ কোটি ডলার আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইয়ানুকোভিচ তাতে সাড়া দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। এতে মধ্য-পশ্চিম ইউক্রেনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২০০৪ সালের কমলা বিপ্লবের অনুসরণে ২০১৩-১৪ সালের রাজধানী কিভের কেন্দ্রস্থলে মাইদান বিক্ষোভ (ইউরো-মাইদান বিক্ষোভ নামে বেশি পরিচিত) শুরু হয়। অতি দ্রুত এই বিক্ষোভের রাশ চলে যায় অতি দক্ষিণপন্থী ও নয়া নাৎসী সংগঠনগুলোর হাতে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি মদত দেয় এই বিক্ষোভে। মার্কিন সচিব ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড এবং ইউক্রেনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত জিওফ্রি পাইয়াট স্বয়ং ইউরো-মাইদান আন্দোলনে বিক্ষোভকারীদের মদত যোগাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কোয়ারে উপস্থিত হন। আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইয়ানুকোভিচের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষে ইয়ানুকোভিচ ইউক্রেন থেকে পালিয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নেয়। যা ছিল এক বিক্ষোভ মাত্র, তা অতি দ্রুত পরিণত হয় ক্যু-তে।

নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করল চরম দক্ষিণপন্থী ও

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে

অতীত সংগ্রামের ঐতিহ্যে উদ্দীপ্ত হোক বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আগামী ২৪-২৬ ডিসেম্বর, '২২ জলপাইগুড়ি জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১৯৫৬ সালে সংগঠনের গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পথ চলা শুরু। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে চলা সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বভাবতই, এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সব অংশের কর্মচারী সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। সম্মেলনকে সামনে রেখে নবসচেতনতামূলক কর্মসূচীর ইতিবাচক প্রভাব জেলার চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকার জনজাতির মধ্যেও পড়ছে। রাজ্য সম্মেলনকে সফল করতে প্রত্যন্ত বনাঞ্চল থেকে জলপাইগুড়ি সদর—প্রায় প্রতিটি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন।

পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। ক্রমবর্ধমান শ্রেণি শোষণ এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। আবার অর্থনৈতিক সঙ্কট যত গভীরতর হচ্ছে শোষক শ্রেণিগুলি তাদের শ্রেণী শোষনকে ততই তীব্রতর করে তা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছে। আবার সেই নিষ্ঠুর শোষণের পথকে প্রশস্ত করে দেওয়ার জন্য তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে নগ্নভাবে তাদের অর্থনৈতিক নীতি, শ্রমনীতি, শিক্ষানীতি তথা সমগ্র রাষ্ট্রনীতিতে পুঁজিপতিদের হাত শক্ত করতে ক্রমেই আরও বেশি বেশি জনবিরোধী মাত্রা সংযোজন করে চলেছে। অধিকাংশ রাজ্য সরকার একই পথ অবলম্বন করছে। এই অবস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়াগুলিও রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে হাজির হচ্ছে। দাবি-দাওয়া অর্জনের প্রশ্নটি মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে অনুসৃত শ্রেণি-নীতিকে পরাস্ত করার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। একই সাথে সেই শ্রেণি নীতি থেকে উদ্ভুত বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত ও অন্যান্য বিভেদের শক্তিগুলির তৎপরতা সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট হয়ে ক্রমেই হিংস্র চেহারায় আত্মপ্রকাশ করছে, যা সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার বিকাশমান সংগ্রামের সামনে সমূহ বিপদ আকারে দেখা দিচ্ছে।

এই পটভূমিকায় নিজেদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থেই পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চিন্তাভাবনাকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা মুক্ত করে ক্রমাগত প্রসারিত করা এবং রাজ্যব্যাপী কর্মচারী আন্দোলনকে শ্রেণি চেতনায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হবার বহুমুখী প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

যে বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে সামগ্রিকভাবে এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারী আন্দোলনকে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে তা হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। অনেক অত্যাচার, আত্মত্যাগের বিনিময়ে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে এই সংগঠন। এর পেছনে রয়েছে একটি নির্ভুল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। আন্দোলনের সেই বৈচিত্র্যময় ক্রমবিকাশের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এই প্রজন্মের কর্মচারীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কারণ তাঁদেরই উপর ন্যস্ত হয়েছে পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্যকে বহন করে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব।

পরিস্থিতির নতুন নতুন বাঁকে দাঁড়িয়ে রাজ্য সম্মেলন থেকে নতুন নতুন রাস্তা খুঁজে নিতে হয়েছে। এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির মধ্যে আসন্ন বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অতীতের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পথ ধরেই উত্তরণের পথ নির্ধারণ করতে হবে।

১৯৫৬ সালে সংগঠনের পথ চলা শুরু হলেও প্রথম সম্মেলন হয়েছিল ১৯৬২ সালের ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর। সেই সময়টা ছিল মারাত্মক প্রতিকূল পরিস্থিতি। বিশেষ করে বামপন্থী ও বামমনস্ক সংগঠনগুলির কাছে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তৎকালীন শাসকদল বামপন্থীদের উপর তীব্র বর্বর আক্রমণ সংগঠিত করেছিল। বামপন্থী নেতা-কর্মীদের জেলবন্দী করেছিল। বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে বামপন্থীদের দেশদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। দেশে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল। এর প্রভাব আমাদের সংগঠনের উপরেও পড়েছিল। সংগঠনের ৫ জন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তখন কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিজস্ব কোনো ফান্ড ছিল না। সমিতির কর্মীরা বরখাস্ত কর্মচারীদের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে কলকাতা স্টুডেন্টস্ হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সম্মেলন।

১৯৬৪ সালের ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর এই স্টুডেন্টস হলেই অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন। পরিস্থিতির নিরিখে সেই সময়টাও ছিল অস্বস্তিকর। বাম রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত লড়াই যার প্রভাব সংগঠনের অভ্যন্তরেও পড়েছিল। এই বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং দমন পীড়নের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে তীব্র গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। রাজ্যে প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বে খাস জমি উদ্ধারের জন্য জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সর্বোপরি প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার ফলে তীব্র গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সরকারী কর্মচারীদের রাজপথে আন্দোলন নিষিদ্ধ করার ফতেয়া জারি করা হয়। এর বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ২৭ এপ্রিল, '৬৮ গণ-অবস্থানের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সেদিন এসপ্লানেড ইস্ট কার্যত কর্মচারীদের দখলে চলে যায়। কলকাতার রাজপথ জনপ্লাবনে পরিণত হয়। পুলিশ প্রশাসন সেই গণ অবস্থানকে আটকাতে ব্যারিকেড তৈরি করে। কর্মচারীরা অসম সাহসিকতা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের মুখোমুখি হলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে থাকে। সেই সময়ে প্রাজ্ঞ নেতৃত্ববৃন্দ হিংসাত্মক পরিস্থিতি এড়াতে ক্ষুব্ধ কর্মচারীদের ময়দানে সরিয়ে নিয়ে যান। ময়দানের সমাবেশ থেকে ১৬ মে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের

পুরুলিয়া জেলায় বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী

প্রথম ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয় ময়দানের ঐ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রদ্ধেয় জননেতা জ্যোতি বসু। শত হুমকি, কালা সার্কুলার অমান্য করে শাসক শ্রেণির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ধর্মঘটকে দারুণভাবে সফল করে পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের শক্তিশালী অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ধর্মঘট পরবর্তীতে কর্মচারীদের উপর তীব্র দমন-পীড়ন নামিয়ে আনার প্রতিবাদে কর্মচারীরা দপ্তরে দপ্তরে কাজ বন্ধ করে দেয়। প্রশাসন স্তব্ধ হয়ে যায়। কর্মচারীদের এই লড়াকু মেজাজের কাছে তৎকালীন রাজ্যপাল ধরমবীরকে পিছু হঠতে হয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলনকে বিপথে চালিত করতে বাম সঙ্কীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রবণতা মাথা চাড়া দেয়। এইরকম পরিস্থিতিতে ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর, '৬৮ সালে কলকাতার এ.বি.টি.এ হলে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলন আন্দোলনের নতুন দিশা দেখায়।

চতুর্থ সম্মেলনের প্রাক্কালে সন্ত্রাসের সম্মুখীন হতে হয় রাজ্যের কর্মচারী সমাজকে। ১৯৭১ সালে সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারায় সংগঠনের প্রথম সারির ১৩ জন নেতৃত্বকে বরখাস্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পদদলিত করে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়। তার পূর্বে চক্রান্ত করে ভেঙে ফেলা হয় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে। বিধানসভা ভোটের দিন ব্যাপক রিগিং-এর প্রতিবাদ স্বরূপ বামপন্থীরা সমস্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। সহস্রাধিক বামপন্থী নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণ নামায় শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনী। শাসরুদ্ধকারী অন্ধকারের রাজত্বে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৬০ জন নেতা-কর্মী-কর্মচারী খুন হন। জেলায় জেলায় সংগঠন দপ্তর দখল করা কিংবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসনের অভ্যন্তরে চলে প্রশাসনিক সন্ত্রাস। এর বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্রতর করার শপথ নিয়ে কলকাতার ত্যাগরাজ হলে ১৯-২১ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ সম্মেলন।

পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন (২২-২৪ মার্চ, ১৯৭৫) ত্যাগরাজ হলেই অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার পটভূমিতে দেশজুড়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক ভূমিকার বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ গোটা দেশ। সম্মেলনের পরে পরেই ২৫ জুন মধ্যরাতে 'জরুরি' অবস্থা জারি করা হয়। সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের 'মিসায়' গ্রেপ্তার করা হয়। সংগঠনের ১৫ জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে মিসায় গ্রেপ্তার করে বরখাস্ত করা হয়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির তৎকালীন সভাপতি শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও কমলা রঞ্জন রায় বর্মন। কমলা রঞ্জন রায় বর্মন পরবর্তী সময়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জেলে থাকা বরখাস্ত নেতৃবৃন্দকে রক্ষার জন্য গোপনে অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। ব্যাপক অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে লড়াকু নেতৃত্ব ও তাদের পরিবারকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন কর্মচারীরাই।

এই সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ধারন করেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলনে প্রবেশ করে। ১-৪ মার্চ, ১৯৭৯ তারিখে মেদিনীপুরে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। ইতিমধ্যে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সাধারণ জনগণের মধ্যে সুস্থ জীবন ধারনের নতুন উন্মাদনা তৈরি হয়। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের অবসানের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাস্তবিক হয়ে ওঠে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনের লক্ষ্যে '৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত। গ্রামের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে খাস জমি বণ্টনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে আলোর দিশারী হিসাবে দেশ-বিদেশের কাছে উপস্থিত করা হয়।

বামফ্রন্টের ৩৪ বছর সমাজের সব অংশের মানুষের কাছে যেমন স্বস্তিদায়ক ছিল, তেমনি সরকারী কর্মচারীদের কাছে ছিল স্বর্ণযুগ। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে কর্মচারী স্বার্থবাহী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধারাবাহিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তবতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮২ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত সপ্তম থেকে ষোড়শ পর্যন্ত ১১টি রাজ্য সম্মেলন।

২০১০ সালে অনুষ্ঠিত ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন পরবর্তীতে ২০১১ সালে রাজ্যে পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন করে জনগণ সহ কর্মচারীদের নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিযুক্ত সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশে গড়ে ওঠা বর্তমান কর্মচারী সমাজ নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে থাকে, যা পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আর্থিক অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ে বেড়ে ওঠা কর্মচারী সমাজের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তন, মানসিকতার পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। সমাজে মধ্যবিত্ত অংশের ঘেরাটোপে বেড়ে ওঠা কর্মচারী সমাজে ভোগ বিলাসের আকাঙ্ক্ষাও বাড়তে থাকে। বিশ্বায়িত অর্থনীতির প্রভাব জীবন-জীবিকার উপরে পড়তে থাকায় সংগ্রাম-আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কমতে থাকে। একাংশের নেতা, কর্মীরা ভয়-ভীতির সন্ত্রস্ত পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কর্মচারীদের নীতি বহির্ভূত হয়রানিমূলক বদলী, ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার দখল, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতাকে অস্বীকার, ষষ্ঠ বেতন কমিশন চালু করতে অযথা টালবাহানা ইত্যাদি নানাবিধ অধিকারগত আক্রমণের বিরুদ্ধে নানাবিধ পন্থায় আত্মত্যাগী সাহসী সংগ্রামের উত্তাপে উদ্দীপ্ত হয়ে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন (২৭-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩) উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে অনুষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠ বেতন কমিশন নিয়ে অযথা টালবাহানার বিরুদ্ধে বিকাশভবন অভিযান করে লাগাতার অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে রাজ্যের শাসকশ্রেণির শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী শ্রেণি চরিত্র উন্মোচনে সমর্থ হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই সময়ে দেশে চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী শক্তির শাসন ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বিভাজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ বহুমাত্রিক বিভাজনের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পরিবেশের মধ্যে কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনার পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সাংগঠনিক দৃঢ় অবস্থান নির্ধারণের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন।

একদিকে রাজ্যের সাধারণ জনগণের প্রতি সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে চরম উপেক্ষা, অপরদিকে রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রতি সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনার ধারা অব্যাহত রাখা হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু করার প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী অস্থিরতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দেশের মানুষকে তার জীবন-ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়ের সংস্থানের থেকেও নতুন করে নাগরিকত্ব প্রমাণ দেওয়াকে আশু কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। নরেন্দ্র মোদির আজ্ঞাবাহক কতিপয় পুঁজিপতির স্বার্থে 'নোট বন্দী'র নামে কালো টাকা উদ্ধারের ভাঁওতা দিয়ে সঙ্কটগ্রস্ত দেশীয় অর্থনীতি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর অনেকাংশে চেষ্টা। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে উগ্র জাতীয়তাবাদী তাস ব্যবহার করে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির পথকে প্রশস্ত করতে চায়। এইরকম বাস্তবতায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুস্থ বাতাবরণ বিনষ্টকারীর বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামের মঞ্চে পরিণত হয় ২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয় ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন। পরিস্থিতি নিরপেক্ষ থেকে নয়, পরিস্থিতিকে ভেদ করেই এতগুলি সম্মেলন এগিয়ে চলেছে।

বর্তমান কর্মচারী সমাজ এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মশাল বাহক। অতীতের গৌরবজনক আত্মত্যাগী, সাহসী সংগ্রামের উত্তাপে উদ্দীপ্ত হয়ে বর্তমানের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সংগঠনের সুমহান ঐতিহ্যকে বজায় রাখা জরুরি।

নয়া উদারনীতির আক্রমণ শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে যে দেশে যেমন বাস্তবতা, সেই দেশে তদনুযায়ী সচেতনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। জনমানসে সহজাত যে আক্রোশ আছে তাকে সংগঠিত করে সচেতন শ্রেণি সংগ্রামের রূপ দেওয়াটাই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের কাজ। শাসকশ্রেণি সবসময় চায় সমাজের মধ্যে বিভাজন করে রাখতে। পুঁজিবাদ সঙ্কট থেকে বাঁচতে মুনাফাকে স্থিতিশীল রাখতে এটা করে যাতে প্রতিরোধ দানা বাঁধতে না পারে। তাই ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে, পরিচিতি সত্তার রাজনীতির নামে, পোস্ট মর্ডানিজমের নামে মেহনতী মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়। এগুলি কোনোটাই বিচ্ছিন্ন নয়। শাসক শ্রেণির সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ। শোষণের অঙ্গ। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের সামনে এই আক্রমণের স্বরূপ নিয়ে সার্বিক বোঝাপড়া নিজেদের মধ্যে তৈরি করা, এবং ওদের পরিকল্পনা অনুধাবন করা হোক অন্যতম কেন্দ্রীয় অভিমুখ। শুধু নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়া তৈরি করা নয়, গোটা সমাজের মধ্যেও এই বোঝাপড়া তৈরি করা সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের কাজ। কর্মচারী আন্দোলনের সামনে কেন্দ্রীয় কাজ হচ্ছে ঐক্যকে অটুট রাখা, সম্প্রসারিত করা। স্থায়ী ও অস্থায়ী নির্বিশেষে সকল অংশকে লড়াইয়ের ময়দানে সামিল করানো।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন ঘোর সঙ্কটে। এই সঙ্কট থেকে বাঁচবার জন্য উৎপাদনে পুঁজি কমছে। খরচ কমাতে নিয়মিত শ্রমিক কমছে, বাড়ছে চুক্তিতে অস্থায়ী, অনিয়মিত শ্রমিক। কাজের আউটসোর্সিং হচ্ছে সর্বোপরি জনগণের জন্য পরিষেবা

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

যুদ্ধের অন্তরালে ছায়া যুদ্ধই মুখ্য

নয়া নাৎসীরা। ইউক্রেনে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থানের একটা অতীত আছে। ১৯২৯ সালে ইতালীয় ফ্যাসিবাদী মডেলে ভিয়েনায় সৃষ্টি হয় 'অর্গানাইজেশান অব ইউক্রেনীয়ান ন্যাশানালিস্টস' বা OUN। যারা হিংসাত্মক পদ্ধতিতে এক স্বাধীন ইউক্রেন গঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। OUN ইউক্রেনে অবস্থানরত রুশ, পোল, ইহুদিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। OUN-র একটা অংশের নেতা ছিলেন স্তেপান বান্দেরা যিনি ১৯৩৮ সালে নাৎসি জার্মানির সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৫৩ সালে OUN বিলুপ্ত হয়ে গেলেও শেষ হয়ে যায়নি। ২০০৪ পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে তাদের আবার নতুন ভাবে বিকশিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। আই এম এফ-র থেকে অর্থনৈতিক সংস্কারের শর্তে লোন নেবার ফলে আর্থিক সঙ্কট, তীব্র বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি, নেতা-মন্ত্রীদের ব্যাপক দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি ইউক্রেনবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। এর সাথে ইউক্রেনীয় ও রুশ জাতিসত্তার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তো যুক্ত ছিলই। মানুষের ক্ষোভকে ব্যবহার করে নয়া নাৎসীরা প্রভাব বিস্তার করতে লাগল ইউক্রেনের বুকে। ২০১৩-১৪ সালের মাইদান বিক্ষোভের পর এরা রাষ্ট্রীয় মদত পেতে আরম্ভ করে। মে দিবসের মিছিল, ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন ও অন্যান্য বামপন্থী কর্মসূচীর ওপর নয়া নাৎসী বাহিনীর আক্রমণ শুরু হল। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নেওয়া হল না। বামপন্থী সংগঠনগুলি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত পেল তারা।

২০১৪-র ইউরো-মাইদান ক্যু ঘটার পর ক্রাইমিয়াতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রুশ ভাষাকে নিষিদ্ধ করা সহ নয়া নাৎসীদের অন্যান্য কার্যকলাপ তারা মানতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রাইমিয়াকে ইউক্রেনের সাথে যুক্ত করেছিল। ২০১৪-র পরিস্থিতিতে ক্রাইমিয়ার আঞ্চলিক সরকার গণভোটের আয়োজন করে। ৯৭ শতাংশ ক্রাইমিয়াবাসী ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে রায় দেয়। এই গণভোটের রায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে বড়ো ধাক্কা দেয়।

একইভাবে ইউরো-মাইদান ক্যু-এর প্রভাব পরে ইউক্রেনের পূর্বের ডনবাস এলাকায়। এই অঞ্চলে রুশভাষী মানুষ ৬৫ শতাংশ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভারি শিল্প সমৃদ্ধ ডনবাসের মানুষের আশঙ্কা হয় যে ক্যু-এর ফলে যেভাবে ই ইউ-র সঙ্গে সংযুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেন তাতে তাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। তাদের আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ক্যু-এর পরবর্তীকালীন শাসক পোরোশেঙ্কোর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। তার সময়ে আই এম এফ-এর সঙ্গে আরও এক দফা চুক্তি হয়। বেল আউট প্যাকেজের শর্তে ৪০০০ কোটি ডলার ঋণ পায় ইউক্রেন। ঋণের শর্তাবলীর মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ করা, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ লোক কমানো, ৬০ শতাংশ বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি নানা নেতিবাচক শর্ত ছিল। ডনবাসের জনগণের ক্ষোভের আরও কারণ হল পুরনো নাৎসী নেতা ও সংগঠনগুলির পুনর্বাসন এবং এর প্রভাবে ডনবাস সহ সমগ্র ইউক্রেনে নয়া নাৎসীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়া।

ডনবাসের স্থানীয় প্রশাসন মে ২০১৩-তে ইউক্রেনের মধ্যে থেকেই স্বায়ত্বশাসন দাবি করে গণভোট করল। ৮৯ শতাংশ মানুষ স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে রায় দিল। গঠিত হল ডনেৎস্ক পিপলস রিপাবলিক এবং লুহানস্ক পিপলস রিপাবলিক। ডনবাসের মানুষের এই বিদ্রোহ দমন করার উদ্যোগ নিল ইউক্রেন রাষ্ট্রীয় শক্তি ও নয়া নাৎসী বাহিনী। কিন্তু ব্যর্থ হল প্রয়াস। কারণ ডনবাসের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্রের নির্দেশ অস্বীকার করে বিদ্রোহীদের পক্ষে দাঁড়ালো। এবার সরাসরি নয়া নাৎসি বাহিনীদের ডনবাসে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডনবাসে সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি ও পেনশন ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হল। শুরু হল 'সন্ত্রাস দমন' অভিযান। ২০২১ সাল পর্যন্ত ডনবাসে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমন অভিযানে ১৪ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ৩০ হাজার। প্রায় ৩৩ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ইউক্রেনের অন্যত্র, রাশিয়া ও বেলারুশে চলে গেছে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর পর ফেব্রুয়ারি ২০১৫-তে যুদ্ধবিরতির জন্য ১৩ দফা সূত্র নিয়ে 'মিনস্ক চুক্তি' হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ইউক্রেন সরকার শুধু যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না, ডনবাসে বৃহত্তর স্বায়ত্ব শাসন দেবে এবং ডনবাসের দুটি বিদ্রোহী অঞ্চলকে নিজস্ব সরকার গঠনে সম্মতি দেবে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মান্যতা পেলেও আজও কার্যকরী হয়নি এই চুক্তি।

ইউক্রেনে বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পিছনে আরেকটি বড় কারণ হল ইউক্রেনকে ন্যাটো-র সদস্য করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র। কিন্তু ন্যাটো পরিস্থিতিগত কারণেই এখন আর থাকার কথা নয়। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জুজু দেখিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপের ১২টি দেশকে নিয়ে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটো নামক সামরিক জোট গঠন করে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব নেই, ঠাণ্ডা যুদ্ধও নেই—তাহলে ন্যাটোর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে কেবল সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মানসিকতার কারণেই। সোভিয়েত থাক বা না থাক যুদ্ধ বাঁধাবার নীতি, পরদেশ আক্রমণের নীতি, অন্য দেশকে ভয় দেখানোর নীতি—এটাই তো সাম্রাজ্যবাদের মূল রণনীতি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কয়েক মাস পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের প্রতিরক্ষা সচিব পল ওলফোউইজ নিউইয়র্ক টাইমস-এ (মার্চ, ১৯৯২) একটি 'ডিসেন্ট পলিসি গাইডেন্স' প্রকাশ করে বলেন, 'ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় কোনো বৈশ্বিক প্রতিযোগীর উত্থান ঘটবে সেটা মাথায় রেখে তাকে নিরস্ত্র করার জন্য আমাদের নীতি প্রণয়ন করা উচিত। রাশিয়া ইউরেশিয়াতে সর্বাধিক সামরিক ক্ষমতার অধিকারী।... তাই অতি প্রয়োজনীয় হল আমেরিকার পক্ষ থেকে ব্যতিক্রমী কিছু পদক্ষেপ করা, যার মাধ্যমে রাশিয়ার ভূরাজনৈতিক অবস্থানকে স্থায়ীভাবে ও চূড়ান্তভাবে দুর্বল করা যাবে, তারা তাদের শক্তি পুনরুদ্ধার করার আগেই। তার জন্য পশ্চিমী রণনীতিগত কক্ষপথে সেই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে টেনে আনতে হবে যারা হয় সোভিহয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল কিংবা তার প্রভাব থেকে আগেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।" এই কারণে ন্যাটো শুধু প্রয়োজন নয়, তার পূর্বদিকে সম্প্রসারণও জরুরি।

১৯৯০-র দশকের শুরুতেই তৎকালীন রাশিয়াকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদের আর এক দফা পরিকল্পনার সূত্রপাত। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরপরই মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব জেমস বেকার তৎকালীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান মিখাইল গর্বাচেভকে মৌখিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে 'ন্যাটো পূর্ব দিকে এক ইঞ্চিও এগোবে না।' ১৯৯৬ সালে বিল ক্লিন্টন যখন রাষ্ট্রপতি তখন তেকেই ১৮০ ডিগ্রী অবস্থান পরিবর্তন করা শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৯৯ সালে ন্যাটো পূর্ব ইউরোপের দেশ চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৪-এ অন্তর্ভুক্ত হয় বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া এবং স্লোভেনিয়া। ২০০৯-এ আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া, ২০১৭-তে মন্টেনিগ্রো, ২০২০-তে উত্তর ম্যাসেডোনিয়া। মানচিত্র দেখলেই বোঝা যাবে যে ন্যাটো এখন রাশিয়ার ঘারের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে। এই মুহূর্তে ন্যাটোর সদস্য দেশের সংখ্যা ৩০। ন্যাটোর সদস্য নয় এমন ৩৭টি দেশ আছে যাদের সাথে ন্যাটোর সামরিক জোট আছে। জর্জিয়া, ইউক্রেন বাদে পূর্ব ইউরোপের প্রায় সবক'টি দেশ ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে। রাশিয়ার সীমান্তে ১,৭৫০০০ সেনা মোতায়ানে করেছে। ইউক্রেন আর জর্জিয়াকে ন্যাটোতে যুক্ত করতে পারলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাধ পূর্ণ হয়। ২০০৮ সাল থেকে সেই প্রক্রিয়া চলছে। এক্ষেত্রে সঙ্গী দেশগুলির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা দ্বন্দ্ব আছে। ইউক্রেন ও জর্জিয়া ন্যাটোর আনুষ্ঠানিক সদস্য না হলেও তারা ন্যাটোর অ্যানুয়াল ন্যাশনাল প্রোগ্রাম-এর অন্তর্ভুক্ত। তারা নিয়মিত ন্যাটোর বৈঠকে অংশগ্রহণ করে।

১৭ ডিসেম্বর ২০২১ রাশিয়া ন্যাটোর কাছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি খসড়া চুক্তি পেশ করে। তাতে বলা হয় ন্যাটো পূর্ব দিকে সম্প্রসারণের চেষ্টা বন্ধ করবে। আরও বলা হয় ন্যাটোকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তারা রাশিয়ার সীমানা বরাবর দেশগুলিতে ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েন বন্ধ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো কেউই রাশিয়ার এই খসড়া চুক্তিতে কোনোও সাড়া দেয়নি।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনকে প্রায় ৪০০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিয়েছে। এছাড়া ইউরোপের প্রায় প্রতিটি ন্যাটো জোটভুক্ত দেশ, এমনকি সুদূর অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ইউক্রেনকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে চলেছে। সবচেয়ে বিপদের দিক হল ডনবাস যুদ্ধে গত ছয় বছরে ৫০টি দেশ থেকে ১৭ হাজার নয়া নাৎসি ইউক্রেনে এসে অ্যাজভ রেজিমেন্টের (২০১৪ সালে গঠিত নয়া নাৎসি গোষ্ঠীগুলির একটি জোট) সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করেছে। রণ বিশেষজ্ঞদের মতে ন্যাটোর ভূমিকা সহ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে, যেখানে রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন হামলা 'অনিবার্য' হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধ কার্যত ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার নয়। রাশিয়ার সাথে সমগ্র ন্যাটো জোটের ছায়াযুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে।

রাশিয়াকে কেন্দ্র করে মার্কিনী ন্যাটো ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে চলে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদ রাশিয়াকে চাপে ফেলতে ইউক্রেনকে ডনবাসের বিরুদ্ধে আক্রমণে মদত দিচ্ছে। অস্ত্র ও অর্থের যোগান দিচ্ছে। নিও-ফ্যাসিবাদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে যা শুধু রাশিয়া বা ইউক্রেনের মানুষের নয়, ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর আশঙ্কার কারণ হতে পারে। এতদ্‌সত্ত্বেও যুদ্ধ শেষ কথা হতে পারে না। এই যুদ্ধে হাজার হাজার নারী-শিশু সহ নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছেন। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে।

রাশিয়ার উপর ন্যাটো-মার্কিনী চাপ রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের অন্যতম কারণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই কি সব? রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিনের কথাবার্তা, আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে ১৯১৭-র বিপ্লব পূর্ববর্তী জার সাম্রাজ্যের প্রতি নরম মনোভাব দেখা যাচ্ছে। জার সাম্রাজ্যের সেই বৃহত্তর রাশিয়ার পুনর্গঠন প্রকল্পে ইউক্রেন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে পুতিন বর্তমান ইউক্রেনকে 'ভ্লাদিমির লেনিনের ইউক্রেন' বলে আখ্যায়িত করে বলশেভিকদের উপর আলাদা ইউক্রেন তৈরির দায় চাপিয়েছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক লেনিনবাদী নীতি, যা নভেম্বর বিপ্লবের পর অনুসৃত হয়েছিল তাকে দোষী করছেন। যে নীতির দ্বারাই ১৯২২ সালে বিচ্ছিন্নতার অধিকার সহ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, যা ১৯২৪ সালে সোভিয়েত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পুতিন এই কর্ম পদ্ধতিকে 'মূল পাপ' বলে চিহ্নিত করে বলেছেন যে এর মধ্য দিয়েই সাবেক সেভিয়েত প্রজাতন্ত্রে জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছিল। পুতিনের এই ধরনের বক্তব্য কার্যত বিপ্লব পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যবাদী জারের দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমর্থন করছে। সেই অবস্থার পুনরুদ্ধার করাটাই আজকের বিশ্বের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমনটাই মনে করেন পুতিন। পুতিনের এই ধরনের মানসিকতাও বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষকে আরও জটিল করেছে।

গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের প্রত্যাশা অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ হোক। সোভিয়েতের অবলুপ্তির পর ওয়ারশ চুক্তির অবলুপ্তি ঘটেছে, তাই ন্যাটোও অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। একে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকের ভূমিকায় ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। এর পূর্বমুখী প্রসারণ বন্ধ করতে হবে। রাশিয়াকে আক্রমণের লক্ষ্য করে তার চারপাশের সীমান্তে মোতায়েন করা ন্যাটোর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। রাশিয়া ও ইউক্রেনের শতাব্দীর পর শতাব্দী একত্রিত হয়ে থাকার ইতিহাস আছে। ইউক্রেনের পশ্চিম অংশে ক্যাথলিকদের সংখ্যাধিক্য, এরা ইউক্রেনিয়ান ভাষায় কথা বলে, আবার পূর্ব দিকে অর্থোডক্স রাশিয়ানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এদের ভাষা রাশিয়ান। এই দুটি দেশের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে নিবিড় আলোচনা প্রয়োজন। শান্তি আলোচনায় শুধু রাশিয়া, ইউক্রেন নয় এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত সব পক্ষকে যুক্ত করতে হবে। ভারত সরকারকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা অবস্থান থেকে সরে এসে জোট নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে শান্তি প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের এখনও অবধি অবস্থান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী নয়। হোয়াইট হাউস ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল-এর ডিরেক্টর ব্রায়ান দীস সম্প্রতি ভারত প্রসঙ্গে তাদের হতাশা ব্যাক্ত করেছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ইউক্রেন এবং সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়ার বিরোধিতার মধ্যেও ইউক্রেনের ৪টি অঞ্চল ডনেৎস্ক, লুহানস্ক, খেরসন ও জাপোরঝিয়ার সংযোজন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার উদ্যোগে এই গণভোটকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে এবং এর বিরোধিতা করে রাষ্ট্র সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আনা একটি প্রস্তাবে চিন, ব্রাজিল, গ্যাবন সহ ভারত ভোটদানে বিরত থাকে। ভারতকে এটা ভুললে চলবে না যে, অতীতে বহু সঙ্কটে বিশেষ করে কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন। বর্তমানে রাশিয়াও এই প্রসঙ্গে ভারতের পাশেই আছে। আমেরিকার এই ক্ষেত্রে অবস্থান ঘোলা জলে মাছ ধরা। আমেরিকা চিনকে কোণঠাসা করতে যে কোয়াড গঠন করেছে ভারত তাতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভারতকে তাদের পাশে প্রয়োজন। সার্বিকভাবে বিচার করলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত মার্কিন স্বার্থবিরোধী অবস্থান নিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কঠোর মনোভাব দেখানোর অবস্থায় এখন নেই। সুতরাং রাশিয়া-ইউক্রেন প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান নিরপেক্ষ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

অতীত সংগ্রামের ঐতিহ্যে উদ্দীপ্ত হোক বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

খরচ কমছে। সেইজন্য রেগার খরচ কমাচ্ছে। পেট্রোল-ডিজেলের ভর্তুকি তুলে বিনিয়ন্ত্রণ হয়ে যাচ্ছে। পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে ফিসক্যাল ডেফিসিট কম করে তার বোঝা সাধারণ জনগণের ওপর চাপানো হচ্ছে। সব জায়গায় পি পি পি অর্থাৎ পাবলিকের মানিতে প্রাইভেট লুঠ। জমি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারের কোনো দায়িত্ব থাকবে না, যাতে ব্যবসাদাররা ব্যবসা করতে পারে। মনমোহন সিং-এর জমানায় চালু হওয়া নীতিকে জোর কদমে রূপায়িত করতে চাইছে বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে সারা দেশের শ্রমজীবী জনগণ লড়াই করছে। আমাদেরও এই লড়াইয়ে শরিক হতে হবে। আমাদের খুঁজে বার করতে হবে আমাদের দুর্বলতার দিকগুলি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ধারাবাহিক লড়াই সংগ্রাম জারি আছে। তবে আমাদের দুর্বলতা আমরা অনুগামীদের মধ্যে সত্যটা নিয়ে যেতে পারছি না। চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর শোষণ আরও মারাত্মক। এদের যুক্ত না করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হবে না। এদের সংঘবদ্ধ করার বর্ধিত দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিভাবে? তার দিশা সুচিত করবে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন।

জরুরি দাবি নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে সার্ভে বিল্ডিংয়ে বিক্ষোভ সভা

বর্তমানে রাজ্যের শাসকদলের দুর্নীতি, স্বজন পোষনের ভূমিকা উন্মোচনের ফলে মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের প্রত্যাখ্যান- প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, শাসক দল যত বেশি জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ততই কর্মচারী সহ জনগণের অধিকারের উপর আক্রমণ শানিত করছে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত। কর্মচারী সমাজ আর কতদিন এই বঞ্চনা সহ্য করবেন? সময় এসেছে গর্জে ওঠার। তার ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েছে ৩০ আগস্ট ২ ঘণ্টাব্যাপী কর্মবিরতি পালনের মাধ্যমে। অতীতের গৌরবজনক, আত্মত্যাগী সাহসী সংগ্রামের উত্তাপে উদ্দীপ্ত হয়ে বর্তমানের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সংগঠনের সুমহান ধারাকে বজায় রাখা জরুরি। সমস্ত ভয়ভীতি পরিহার করে সাহসী মানসিকতা, আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়ে দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আসন্ন রাজ্য সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সমগ্র কর্মচারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আর্থিক অনুদান ও কায়িক শ্রম দিয়ে সম্মেলনের বাহ্যিক আয়োজনকে পরিপূর্ণ করার পাশাপাশি অন্তর্বস্তুতে সম্মেলন হবে চেতনা, আত্মত্যাগ, সাহসিকতায় ভরপুর ও এক নবীন প্রজন্মের নেতৃত্বে পরিচালিত মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের সূচনা মঞ্চ। শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামতে হবে কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। এই সময়ে প্রয়োজন সাহসী বীর যোদ্ধাদের, যারা রাজ্যের জনগণ ও কর্মচারী সমাজকে রক্ষা করতে পারবেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অতীতের নির্মম দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ঐতিহ্য বহন করে বর্তমান আক্রমণাত্মক পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের শপথ গ্রহণ করবে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন। □

সমিতি সংবাদ

সমিতি সংবাদ

সমিতি সংবাদ

সমিতি সম্মেলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রী ওয়ার্কস ইউনিয়ন-এর ২৪তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বিগত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ কলকাতায় কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে। কমরেড মলয় রায় নগর, কমরেড অসিত গায়েন ও কমরেড অজিত সোম নামাঙ্কিত মঞ্চর রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। সভাপতিমণ্ডলী গঠন ও শোকপ্রস্তাব উত্থাপনের পরবর্তীতে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব প্রদীপ সিংহ। মহতী ২৪তম সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অরূপ পাল ও সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সজল নাথ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় ও খসড়া প্রস্তাবাবলীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ৯ জন প্রতিনিধি। সমস্ত আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক নারায়ন চন্দ্র দে। সম্মেলনকে অভিনন্দিত করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি দেবশঙ্কর সিনহা। রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ১১৭ জন প্রতিনিধির পরিচিতি বিষয়ক তথ্য পেশ করেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সাধন দাস। সম্মেলন থেকে সুকুমার বেরাকে সভাপতি, নারায়ণ চন্দ্র দে-কে সাধারণ সম্পাদক ও সাধন দাসকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৩৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ৫ জন আমন্ত্রিত সদস্য সহ ২০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। রাজ্য সম্মেলন পরিচালনা করে সুকুমার বেরা, প্রভাত দাস ও দ্বিজপদ পালকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। □

রক্তদান কর্মসূচী ও স্মারক বক্তৃতা

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড নরেন গুপ্তের প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৮ সেপ্টেম্বর মির্জা গালিব স্ট্রিটে সমিতির দপ্তরে এক স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবলা মুখোপাধ্যায়। এই সংক্ষিপ্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির অন্যতম সহ সভাপতি তাপস মজুমদার। ৩২ জন কর্মচারী এই শিবিরে রক্তদান করেছেন।

একই উপলক্ষে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভা কক্ষে কমরেড নরেন গুপ্ত স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। 'স্বাধীনতা ৭৫, সংবিধান ৭২, কোন পথে ভারত' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। সভায় শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, ব্রিটিশ ভারতেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু। এর আগে ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছে তারা এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা এসেছিল শুধুমাত্র এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে মাথা তুলেছিল আর এস এস-এর নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী শক্তি। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবিও মাথা তোলে।

দেশভাগের বিনিময়ে ভারত স্বাধীন হয়। অনেক বিতর্কের পর ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণ করে। কিন্তু বর্তমান ভারতের শাসকশ্রেণি সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে চলেছে। একই সঙ্গে এরা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব সম্পাদকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দিচ্ছে। আমাদের রাজ্যের সরকারও সরকারি পরিষেবা বন্ধ করেছে এবং বিরোধিদের গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদের রাস্তা বন্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকেই কার্যকরী করছে। এই দুই শক্তিকেই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অশোক প্রামাণিক। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি উৎসর্গ মিত্র। সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ সহ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায় চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। □

আলোচনা সভা

কৃষি কাগিরী কর্মী সংস্থার ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস-এর কর্মসূচী ও একে কেন্দ্র করে এক আলোচনা সভা সংগঠিত হয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে। 'দেশ ও সংবিধান রক্ষায় শ্রমজীবীদের ভূমিকা" বিষয়ে আলোচনা সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য বলেন লড়াইয়ের ময়দানে ৬৭ বছর পূর্বে সমিতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সমিতির সে লড়াই কর্মচারী স্বার্থে এখনও চলছে। একই সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে দেশ ও সংবিধান রক্ষায় সমিতির সদস্য বন্ধুরা তাদের লড়াকু ভূমিকা প্রতিপালন করছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিটি লড়াই আন্দোলনে সমিতি তার ভূমিকা পালনে সচেষ্ট রয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ মিত্র। মূল আলোচক সি আই টি ইউ নেতৃত্ব সোমনাথ ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের দেশের যে সুপ্রাচীন মহান ঐতিহ্য রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের শাসনকার্যে তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে আর আজকের বর্তমান শাসকদল বিজেপি এবং তাদের মূল চালিকাশক্তি আর এস এস নিজেদের মতো করে সেই ঐতিহ্যের ধারা বহন করতে চাইছে। স্বাধীন ভারত আত্মপ্রকাশের সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার। অপরদিকে একই সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীন হওয়া পাকিস্তান ঘোষণা করেছিল তারা হবে ইসলামিক রাষ্ট্র। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের শাসনকালে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক বিভাজন জারি রাখার চেষ্টা করেছে। তারাই ফলশ্রুতি দেশের বিভাজন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্ট ও আর এস এস-এর ভূমিকা আমাদের প্রতিনিয়ত আলোচনা করা উচিত। ভারতবর্ষের বুকে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে লাগাতার পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপিত হওয়া শুরু হয় এবং ১৯২৮-এর লাহোর অধিবেশনে প্রথম তা গৃহীত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়নি। ব্রিটিশরা কমিউনিজমের ভূত দেখেছিল ইউরোপ থেকেই, অপরদিকে আর এস এস-এর একজনও নেতা নেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যার কোনো ভূমিকা আছে। তেভাগা থেকে তেলেঙ্গানা, ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ, একের পর এক শ্রমিক-কৃষকদের যৌথ আন্দোলন ব্রিটিশদের বাধ্য করেছিল দেশ ছাড়তে। আর এস এস বলত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করা। তাই আর এস এস-এর বীর সাভারকর সেলুলার জেল থেকে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পান। ভারতবর্ষের সংবিধান রচয়িতারা বলেছিলেন, Unity In Diversity অর্থাৎ ভারত হচ্ছে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের দেশ। কিন্তু আজকে আর এস এস চাইছে পুনরায় ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন। তাই আক্রান্ত সংবিধান। সংবিধানকে নতুন করে রচনার চেষ্টা হচ্ছে। মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ ব্যবস্থাকে চালিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়া বিকল্প নেই। মোদি-মমতা দুজনেই শ্রমজীবী মানুষের বিরোধী। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেও মোদি সরকার সমকাজে সমবেতন চালুর উদ্যোগ নেয় না, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় পেয়েই মোদি রামমন্দির নির্মাণে ব্রতী হয়। কোর্টের রায় পেয়েই একটা ৯০ শতাংশ তৈরি হয়ে যাওয়া কারখানা ভেঙে দেন মমতা, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে রায়কে মান্যতা দেননা। এই বিষয়গুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। রাজ্যের ক্ষেত্রে মূল বিপদ বর্তমান তৃণমূল সরকার এবং দেশের ক্ষেত্রে মূল বিপদ বিজেপি সরকারকে উৎখাত করাই এই সময়ে শ্রমজীবীদের মূল দায়িত্ব। এই দায়িত্ব প্রতিপালনে আসুন আমরা ব্রতী হই। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি অমিতাভ সাহা। সভার প্রারম্ভে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আবির মিত্র, জয় নিয়োগী ও বিপ্লব সরকার। আলোচনা সভার পূর্বে সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর সমিতি ভবন (৭১ সারপেনটাইন লেন)-এ রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। □

আলোচনা সভা

গত ৬ আগস্ট, ২২ বিকেল ৫টায় কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে **পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের** উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল—'বর্তমান পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ভূমিকা'। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও পিপলস্ রিলিফ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ফুয়াদ হালিম।

এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ নন্দী। প্রথমেই বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বরাজ কুমার চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যা দেবলা মুখার্জী বক্তব্য রাখেন।

আলোচক ডা. ফুহাদ হালিম এই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ, অতিমারি মোকাবিলায়, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের বিপর্যয়কর অবস্থা, এই ভাইরাসের চরিত্র পরিবর্তন সম্পর্কে গবেষণায় অবহেলা, ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার কঙ্কালসার অবস্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। বিশ্বের সমস্ত দেশে সরকারী চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার নেপথ্যে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। প্রথম সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার আইন প্রণয়ন হয় জার্মানিতে ১৮৮৩ সালে। মূলত শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যোগে গড়ে ওঠা চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থাকে প্রতিহত করে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা থেকে মানুষকে সরিয়ে আনতে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও আত্মত্যাগের কারণেই দেশে দেশে বাধ্য হয়ে সরকারী চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবা পণ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে জানাবোঝার বিস্তর ফারাক রয়েছে। ক্রেতা জানেন না তিনি যে সমস্যা নিয়ে বিক্রেতার কাছে হাজির হয়েছেন বা তিনি কী ক্রয় করতে এসেছেন ও বিক্রেতা কী বিক্রি করছেন। এই ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইছে পুঁজিপতিরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। মার্কিন সরকার বেসরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থার থেকে পরিষেবা বীমার মাধ্যমে ক্রয় করে। ফলে কোভিডের আক্রমণে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ঐ দেশে। ঐ দেশে ১৯৭২ সালে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। গত পঞ্চাশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল ৭৫ শতাংশ আর হাসপাতালে বেডের সংখ্যা কমে হল ৯ লক্ষ। এর পরিণতিতে এবার আমেরিকাকে ভুগতে হয়েছে। বীমা কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি ঘটল, কিন্তু নাগরিকদের পরিষেবা ন্যূনতম হল।

আমাদের রাজ্যের সরকার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করেছে। পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসরকারী সংস্থায় বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এই টাকা সরকার দেবে। পরিণতিতে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ বাংলায় ৮৫ শতাংশ সন্তান প্রসব হচ্ছে বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হিসাব বলছে এক্ষেত্রে ১০-১৫ শতাংশের বেশি হওয়া উচিৎ নয়। বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা মুনাফার স্বার্থে ৮৫ শতাংশে নিয়ে গেছে। মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে টাকাটা সরাসরি নাগরিককে দিতে হচ্ছে না, কিন্তু আপনার-আমার ট্যাক্সের টাকা চলে যাচ্ছে বেসরকারী সংস্থার হাতে। আয়ুষ্মান ভারত এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ড মানুষের হাতে তুলে নিয়ে বেসরকারী চিকিৎসা পরিষেবা সংস্থার কাছে ঠেলে দিচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের। অথচ কোভিড অতিমারির সময় বেসরকারী চিকিৎসা সংস্থাগুলো দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। মানুষকে বাঁচিয়ে ছিল সরকারী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। তিনি বলেন যে বর্তমানে এটা প্রমাণিত যে সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার বিকল্প কখনোই 'আয়ুষ্মান ভারত' বা 'স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প' হতে পারে না। এটা নাগরিকদের সহিষ্ণুতার সঙ্গে বোঝানো আমাদের সকলের দায়িত্ব।

ডা. হালিমের আলোচনার শেষে বেশ খানিকক্ষণ প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি সাবলীল ভাষায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন।

আলোচনার শেষে বিগত ৬৩তম রাজ্য সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত শতবর্ষের রিলিফ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা. ফুয়াদ হালিমের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বরাজ কুমার চক্রবর্তী। □

সমিতি সম্মেলন

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনেট এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশনের ৪৯তম রাজ্য সম্মেলন ১০-১১ সেপ্টেম্বর '২২ মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত হল।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ মিত্র। যুগ্ম সম্পাদক শ্যামল কুণ্ডুর উত্থাপিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর ২৪ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ সুজিৎ দে, শূন্যপদে নিয়োগ, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ধর্মঘটের অধিকার রক্ষা চুক্তি ও প্রকল্পের কর্মীদের নিয়মিতকরণ, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম সহ দাবি প্রস্তাব পেশ করেন প্রলয় বিশ্বাস। বিভাগীয় কর্মচারীদের দাবি উত্থাপন করেন দেবমাল্য পাল। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন তাপস মালিক, জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সুদীপ সামন্ত। সম্মেলন উপলক্ষে প্রায় চার শতাধিক কর্মচারীর বর্ণাঢ্য মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে। প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধক, বিশিষ্ট সমাজকর্মী সীমা মুখার্জি এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের ২৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে শিশু শিল্পী আরাত্রিকা সিনহা। স্বাধীনতা ৭৫ উপলক্ষে 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমজীবীদের ভূমিকা" সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

সম্মেলন উপলক্ষে নানান সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় টানা চার মাস ধরে। (১) জুন থেকে সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে সরকারী কৃষিখামারে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। 'বিভেদের বীজ নয় গাছের বীজ লাগান'—এই আবেদন সম্বলিত বায়ো ডিগ্রেডেবেল কলম কর্মচারীদের বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিশ্বজুড়ে গাছ লাগানোর বার্তা নিয়ে সাইকেলে ৫০০০০ কিমি পরিভ্রমণ করে চাঁদের পাহাড় জয়ী শ্রী উজ্জ্বল পাল। প্রতিনিধিদের সামনে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দারুণ মনোগ্রাহী হয়। (২) প্রতিনিধিদের আহারের জন্য কৃষকের মাঠে সংগঠনের উদ্যোগে সব্জী চাষ করা হয়। কৃষকের সাথে মৈত্রী বন্ধন গড়ে তোলায় তা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। (৩) সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজ্যস্তরে এবং মেদিনীপুর জেলায় হেলথ্ স্কীম ওয়ার্কশপ কর্মচারীদের আলাপচারিতায় দারুণ কার্যকরী হয়। ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশনের কৃষি ইউনিট এবং সন্দীপ ব্যানার্জী উক্ত ওয়ার্কশপে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন এবং নানান প্রশ্নের সমাধান বাতলে দিয়ে কর্মশালাকে প্রাণবন্ত করেন। (৪) সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কর্মচারী পরিবার পরিজন, স্থানীয় টোটো চালক প্রভৃতির জন্য হেলথ চেক আপ ক্যাম্প করা হয়। রক্ত পরীক্ষা, ই সি জি, চক্ষু পরীক্ষা, সাধারণ মেডিসিন, ফিজিও থেরাপি, ব্লাড প্রেসার ও ত্বকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। (৫) সম্মেলন উপলক্ষে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা কর্মচারীদের দারুণ উৎসাহিত করে। (৬) সম্মেলনের প্রাক্কালে তেভাগা আন্দোলনের ৭৫ বছরকে স্মরণ করে শতাধিক কৃষক ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়—'বিশ্ব খাদ্য রাজনীতি—কৃষকের স্বনির্ভরতার সেকাল-একাল' আলোচনা করেন বিশিষ্ট কৃষিবিদ ড. অনুপম পাল এবং ফোরাম ফর ইন্ডিজেনাস এগ্রিকালচারাল মুভমেন্ট (FIAM)-এর সাধারণ সম্পাদক চিন্ময় দাস। আলোচনার সূচনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। (৭) সম্মেলন স্থলে সত্যজিৎ রায় নামাঙ্কিত সুসজ্জিত পুস্তক বিপনীর ব্যবস্থা করা হয় প্রতিনিধিদের জন্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রীমতী সীমা মুখার্জী পুস্তক বিপনীর উদ্বোধন করে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং পরের দিন মিছিলে উপস্থিত থাকবেন বলে জানান।

সম্মেলন থেকে সুজিৎ দে সভাপতি, সুদীপ্ত সামন্ত সাধারণ সম্পাদক, শ্যামল কুণ্ডু ও সৌমিত্র দে যুগ্ম সম্পাদক, প্রলয় বিশ্বাস কোষাধ্যক্ষ, তাপস মালিক দপ্তর সম্পাদক এবং দেবমাল্য পাল 'আহ্বান' পত্রিকার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ১৩ জনের সম্পাদকমণ্ডলীর সহ ৬৬ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে নতুন প্রজন্মের কর্মচারীদের উপস্থিতি যেমন ছিল, তেমনি নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রায় ৫০ শতাংশ সদস্যের গড় বয়স ৩০ বছর। □

শ্রদ্ধায় স্মরণ

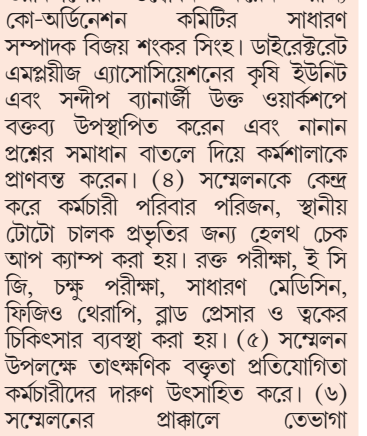

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির নেতা কমরেড আশুতোষ মুখার্জী।

জলপাইগুড়ির মাল নদীর হরপা বানে নিহত কমরেড তপন অধিকারী।

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
50th Year, 5th Edition, September 2022
Regd. No. : 18484/71

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি

কেন্দ্রীয় সমাবেশে উপচে পড়া ভিড়

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সংগ্রামী আন্দোলনের ইতিহাসে যুক্ত হল নতুন এক পালক। চার সহস্রাধিক পেনশনার ও ফ্যামিলি পেনশনার ৯ দফা জরুরি দাবি অর্জনে রানী রাসমনি এভিনিউতে বেলা ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ৩ ঘণ্টার সুশৃঙ্খল অবস্থানের মাধ্যমে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তাদের বঞ্চনাকারীদের বিরুদ্ধে। ৯ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে বকেয়া ৩১ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা/ রিলিফ প্রদান, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, স্বাস্থ্যবীমায় ক্যাশলেশের সীমা বৃদ্ধি, সকলের জন্য পেনশন, বেকারদের জন্য কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি।

তৎপূর্বেই নির্দিষ্ট সময়সূচী মেনেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য বেলা ১টায় নবান্নে পৌঁছে গেছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক দুই যুগ্ম সম্পাদক এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক। নবান্নের সামনে পৌঁছানো মাত্র আরক্ষা বাহিনী ঘিরে ফেলেন তাঁদের। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর সাক্ষাৎকারের পত্র দেখানোর পর মাত্র ২ জনকে অর্থাৎ দুই সাধারণ সম্পাদককে তারা নবান্নের ভিতরে যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু ডেপুটেশন গ্রহণ করার মতো কোনো মন্ত্রী বা আধিকারিক সেখানে ছিল না। অবশেষে দাবিপত্র অনলাইনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়।

গণ অবস্থানের কর্মসূচী শুরু হয় ঠিক ২টার সময়। সমিতির সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত হয় উদ্বোধনী সঙ্গীত। সভাপতি শমীক সেনগুপ্ত ও অন্যান্য সহ সভাপতিগণ সভা পরিচালনা করেন। সভায় ৯ দফা দাবি সম্বলিত মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদিকা অরুণা ঘোষ। তিনি দাবিগুলির যথার্থতা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন রাজ্যে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে সংগঠনকে আরো ইস্পাত দৃঢ় করতে হবে। আমরা বয়সে প্রবীণ হলেও চিন্তায় চেতনায় মননে বার্ধক্য আমাদের ছুঁতে পারেনি। এই মুহূর্তে প্রয়োজন এক সার্বিক অটুট ঐক্য। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় রায় চৌধুরী। তিনি বলেন আজকের সমাবেশ জনজোয়ারে পরিণত হয়েছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৫টি পে-কমিশন কর্মচারী সংগঠনের সাথে আলোচনা করেই প্রকাশিত হয়েছে। আর বর্তমান সরকারের কর্মচারী বিরোধী মনোবাব পে কমিশনের মধ্য দিয়েই প্রতিভাত হয়েছে। তিনি আরো বলেন দাবি আদায়ে প্রয়োজনে কর্মসূচীকে আরো বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানকে ধ্বংস করতে উদ্যত সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির

কেন্দ্রীয় সমাবেশের একাংশ। বক্তা সুজন চক্রবর্তী (ইনসেটে)

সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এক উদ্দীপক বক্তব্য রাখেন। সমাবেশকে অভিনন্দিত করে তিনি বলেন প্রায় লক্ষাধিক সদস্যের এই সংগঠন আমাদের গর্ব। তিনি বলেন আগে কেন্দ্রীয় সরকার সংগৃহীত করের মাত্র ১৯ শতাংশ রাজ্যকে দিত। বাম আমলের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তা আজ ৪২ শতাংশ হয়েছে। তৎসত্ত্বেও আমরা বঞ্চিত হচ্ছি ন্যায্য পাওনা থেকে। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এই রাজ্য সরকারকে বাধ্য করতে হবে মানুষের স্বার্থরক্ষা সহ পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায়।

সভায় বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন গণআন্দোলনের নেতা সুজন চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। সুজন চক্রবর্তী বলেন আগে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রাজ্য দপ্তরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ হত বর্তমান তৃণমূল সরকার তা তুলে দিয়ে অবৈধভাবে টাকা নিয়ে চাকরি দিচ্ছে। পরিবারে উপযুক্ত ছেলেমেয়েরা চাকরি না পাওয়ায় পেনশন নির্ভরতা বাড়ছে। রাজ্যে চলছে তোলাবাজী, অরাজকতা ও লুঠেরাদের রাজত্ব। বাংলার ছাত্র যুবরা লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছে। বয়স্ক মানুষদের তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীবিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য চার সহস্রাধিক অবস্থানরত পেনশনারদের উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রার সাথে তুলনা করেন। তিনি বলেন গোটা মানব জীবনের দাবিতে আপনারা লড়ছেন। সংবিধানের লক্ষ্যমাত্রায় জীবনধারা অতিবাহিত করার জন্য লড়তেই হবে। সরকারে যারা থাকবেন তাদের দায়িত্ব মানুষের মুক্ত চিন্তা মুক্ত মন মুক্ত কণ্ঠকে রক্ষা করা। মানুষকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে ভোগের উপর নির্ভরশীল করার অপপ্রয়াস রুখতে হবে।

সভায় সারা ভারত রাজ্য সরকারী পেনশনার্স ফেডারেশনের আহ্বানে আগামী ৩ নভেম্বর ২০২২ সারা দেশব্যাপী ৬ দফা দাবিতে অনুষ্ঠিতব্য সারা ভারত দাবি দিবসের কর্মসূচী প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন সমিতির অপর যুগ্ম সম্পাদক কাঞ্চন মুখার্জী।

ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে ১৫ সেপ্টেম্বর '২২-এর কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য কোষাগার থেকে পেনশন প্রাপক সংগঠনগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত পেনশনার্স সমিতি, এ.বি.টি.এ পেনশনার সমিতি, কে.এম.ডি.এ পেনশনার্স সমিতি পেনশনার্স সংগঠনগুলির যুক্ত মঞ্চ সভায় উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দিলীপ ভট্টাচার্য, অসিত চক্রবর্তী, প্রদীপ দেব, সঞ্জীব ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন।

অবস্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাঁকুড়া জেলা সম্পাদকের পৌত্রী কিশোরী আরাত্রিকা সিন্‌হা এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন সমিতির প্রয়াত নেতৃত্বের কন্যা সোনালী পাল। তাদের পরিবেশনা সকলের মন জয় করে।

১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য সারাক্ষণ মঞ্চে উপস্থিত থেকে কর্মসূচীকে সফল করতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন।

সুচারুরূপে সভা পরিচালনা করেন সভাপতি শমীক সেনগুপ্ত ও সহ সভাপতি অলকেন্দু চ্যাটার্জী, পবিত্র গাঙ্গুলী, রত্না গাজী ও অশোক দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে সমাবেশ

সারা রাজ্যব্যাপী ব্লক, মহকুমা, জেলায় কর্মচারী সমস্যা সহ জনমানসের বিভিন্ন সমস্যাকে দাবি সনদ করে আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশন ও কর্মচারী সমাবেশের পরপরই প্রিয় সমিতি পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী সমিতি (WBMOA)-র পক্ষ থেকে গত ৭ সেপ্টেম্বর মুখ্য সচিবের কাছে ডেপুটেশন সহ রানি রাসমণি রোডে কেন্দ্রীয় সমাবেশ সংগঠিত করা হয়। মূলত কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, চুক্তিপ্রথায় অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ সহ পাঁচ দফা দাবিতে ছিল এই সমাবেশ। যদিও মুখ্য সচিব কর্মচারীদের যন্ত্রণার কথা শোনার প্রয়োজন অনুভব না করাতে শুধুমাত্র ডেপুটেশন কপি জমা দেওয়ার মধ্যে দিয়েই ঐ কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি করতে হয়।

ঐদিনের জমায়েত শুরু হওয়ার পূর্বে তিনটি মিছিল সংগঠিত করা হয়। ১৩টি জেলার মিছিল একত্রে শুরু হয় মৌলালির এস এন ব্যানার্জি রোডের ক্রশিং থেকে। তিনটি জেলার একত্রিত মিছিল শুরু হয় ভারতীয় জাদুঘর থেকে এবং ১২টি জেলার একত্রিত মিছিল শুরু হয় নবমহাকরণ থেকে। তিনটি মিছিলেই কর্মচারীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্যানারে, পতাকায়, স্লোগানে মিছিলগুলি হয়ে উঠেছিল বর্ণময়। বেলা ১টার অব্যবহতি পরেই মিছিলগুলি এসে উপস্থিত হয় রানী রাসমণি রোডে।

সভার শুরুতেই সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখার পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এই বিক্ষোভ সভাকে পরিচালনা করতে তৈরি হয় চারজনের সভাপতিমণ্ডলী। দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক কমরেড অরূপ চন্দ। এই সমাবেশে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন রাজ্যের তৃণমূল সরকার দেশের সংবিধান, সাংবিধানিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে চলেছে। সময় এসেছে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। কর্মচারীদের ভয়-ভীতি উপেক্ষা করেই এগিয়ে আসতে হবে। হতে হবে আরো সংগঠিত। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে। বেয়াদপ রাজ্য সরকার যে ভাষা বুঝবে সেই ভাষাতেই ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে। অধিকার কোনো দয়ার দান নয়। তার জন্য প্রয়োজনে ধর্মঘটের পথে যেতে হতে পারে। এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। এই রাজ্য সরকার একটার পর একটা বেআইনি কাজ করে চলেছে। প্রতিকার পেতে রাজ্যের বঞ্চিত সরকারি কর্মচারীরা তাদের বকেয়া মহার্ঘভাতা পেতে কলকাতা হাইকোর্টে এসেছিলেন। সেখানে নিজেদের অধিকারের সপক্ষে রায় তারা জিতেছেন। এরপরেও সেই মহার্ঘভাতা বকেয়া থেকে গেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন আদালতে জয় ন্যায্য দাবিকে বৈধতা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই স্বৈরাচারী সরকারের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনাগণ্ডা ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে রাস্তার লড়াই একমাত্র রাস্তা। এই লড়াই লড়তে পারলে উদ্ধত মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হবেন গুটিয়ে যেতে। ইতিহাস এটাই শিক্ষা দিয়েছে স্বৈরাচারীরা শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলবে মেহনতি মানুষেরাই।

এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা বলেন, এই সরকার ভয় পেয়েছে রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের। তাদের সঙ্গে সবক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করে চলেছে। দেশের অবস্থাও একই। দুটি সরকারই ফ্যাসিস্ট কায়দায় শাসন চালাচ্ছে। সংবিধান আজ আক্রান্ত, আইনকে এরা বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। গণতন্ত্র আজ ভুলুণ্ঠিত। ভয়াবহ রকমের বেকারী, নতুন কোনো কর্মসংস্থান হচ্ছে না। তীব্র খাদ্য সঙ্কটের

কলকাতায় সমাবেশের একাংশ। বক্তা বিকাশ ভট্টাচার্য (ইনসেটে)

দিকে এগোচ্ছে দেশ। বর্তমান সময়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসছে। রাজ্য সরকারের ও শাসকদলের মন্ত্রী থেকে নেতা জেলবন্দী হচ্ছে। অথচ তাদের লজ্জার বালাই নেই। সরকারি দপ্তরগুলিতে প্রচুর শূন্যপদ। নিয়োগের বালাই নেই। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিবাদ করলেই হয়রানিমূলক বদলী করে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে। এছাড়াও এই বিক্ষোভ সভায় দাবি সনদের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি (WBMOA)-র সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত। তিনি সমাবেশে উপস্থিত কর্মচারীদের কাছে দাবিগুলির বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে আহ্বান জানান—এই লড়াইয়ের বার্তাকে সমস্ত কর্মচারী সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। দপ্তরে দপ্তরে কর্মচারীদের আরো সংগঠিত হতে হবে। সরকারের ভিত দুর্বল হচ্ছে। কর্মচারীদের নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই সাফল্য নিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কলকাতায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সমাবেশের কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলা নিয়ে শিলিগুড়িতে বিগত ২ সেপ্টেম্বর '২২ কর্মচারী জমায়েত ও এস ডি ও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গের এই সাত জেলার কর্মচারীরা শিলিগুড়ি শহরের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের হলঘরের সামনে ঐ কেন্দ্রীয় সমাবেশে যোগ দেন।

সমাবেশের প্রাক্কালে সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, দার্জিলিং জেলার সম্পাদক সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক ও সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতির উপস্থিতিতে এস ডি ও-কে কেন্দ্রীয় দাবিসনদ তুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ৫ দফা দাবি ও জেলাগুলির নিজস্ব ২ দফা দাবিকে সমাবেশে উত্তরবঙ্গের কর্মচারীদের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক প্রণব কর। সমাবেশ শুরু হয় দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, দার্জিলিং জেলার গণসঙ্গীত টিমের গণসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। সমিতির সভাপতি শেখ আখতার আলি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

বক্তব্য রাখেন সমিতির দার্জিলিং জেলার সম্পাদক সুবীর নাগ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দার্জিলিং জেলার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরকার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত।

দাবির সমর্থনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক দেবব্রত রায় দৃঢ়তার সঙ্গে সমাবেশে ঘোষণা করেন আগামীর লড়াই কর্মচারীদের দাবি অর্জনের লড়াইয়ের ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ঐতিহাসিক লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা, যার মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার যা ধীরে ধীরে বর্তমানের দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার হরণ করছে তা পুনরুদ্ধার করবে।

কয়েক শত কর্মচারী জমায়েত ঐক্যবদ্ধভাবেই সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবকে হাত তুলে সমর্থন জানান। এক বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত মিছিল সমাবেশ শেষে শিলিগুড়ি শহরের হাসপাতাল মোড়, ভেনাস মোড়, হিলকার্ট রোড ধরে সেবক মোড় পেড়িয়ে সোজা এয়ারভিউ মোড়ে এসে শেষ হয়। □

কর্মচারী পেনশনার্সদের স্বার্থে প্রকাশিত হল 'হেলথ্ স্কীম গাইড'

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনেট এগ্রিকালচার এ্যান্ড হর্টিকালচার সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে 'হেলথ স্কীম গাইড'। সমিতির ১৯তম সম্মেলনে এই হেলথ স্কীম গাইডের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা মনোজ রক্ষিত।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কর্মচারীরা যে সকল ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে, তাঁর মধ্যে অন্যতম 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম'। কর্মচারী এবং পেনশনার্সগণ যাতে চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সহজে 'ক্লেইম' করতে পারেন তা উপযোগী করেই পুস্তিকাটি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া যারা প্রশাসনের অভ্যন্তরে 'অপারেটর, রেকমেন্ডিং অথরিটি, এ্যাপ্রুভার কিম্বা HOO হিসাবে কাজ করেন, এই পুস্তিকা ব্যবহার করে কাজ করতে পারবেন। পদ্ধতি এবং ফ্লো চার্টে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে সব বিষয় দেওয়া আছে।

অনলাইনে কাজ করতে হলে হেলথ স্কীমের এ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয়। কিভাবে তা করা যাবে পরপর ছবির সাহায্যে এবং তাতে ফুটনোট দিয়ে বলা আছে, কিভাবে পাশওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। ভুলে গেলে নতুনভাবে কিভাবে করা যাবে তাও দেখানো আছে পুস্তিকাটিতে।

কর্মচারী এবং পেনশনার্সগণ কী কী ধরনের সুবিধা পেতে পারেন তা আদেশনামার নং সহ উল্লেখিত আছে পুস্তিকাটিতে।

যে চার ধরনের চিকিৎসা হয়---(১) OPD (২) নন্ এমপ্যানেল্ড হসপিটাল, (৩) এমপ্যানেল্ড কাশলেস, (৪) এমপ্যানেল্ড ক্যাশলেস ব্যতীত সবক'টির ক্লেইম পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ছবি সহ দেওয়া আছে। 'হেলথ্ স্কীম' পোর্টালে লগ ইন করা থেকে সাবমিশন করা পর্যন্ত কম্পিউটার / কোনো স্ক্রীনে যেভাবে পরপর আসে সেভাবেই পরপর ছবিতে সম্পূর্ণ পদ্ধতি দেওয়া আছে। যে কেউ কাজ করতে পারবেন।

ফলে সাধারণ কর্মচারীর পাশাপাশি আধিকারিকদের কাছেও এটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

এছাড়া ৭৪টি একেবারে প্রথম শ্রেণীর হসপিটালের নাম, ঠিকানা, ই-মেল, কোড নং পুস্তিকাতে দেওয়া আছে। যেটি হাতের কাছে থাকলে বিপদের সময় অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

এককথায় কর্মচারী, আধিকারিক এবং পেনশনার্সদের কাছে হাতের কাছে রাখার মতো পুস্তিকা। মুখবন্ধ লিখেছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিনহা। □

গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সার্ভে বিল্ডিং-এ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতির ডেপুটেশন ও কর্মচারী জমায়েতে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।